পৃথিবীর অধ্যাত্মসাধনা
ও
ভারত

২য় খণ্ড

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৫৯

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ, টেমার লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর

যামিনীভূষণ উকিল

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৯ এ, বিধান সরণী

প্রচ্ছদশিল্পী

ধীরেন শাসমল

নির্মোহ দৃষ্টিতে যাঁরা
অধ্যাত্ম সত্য খোঁজেন
তাঁদের সকলের উদ্দেশে

যে-সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. Encyclopaedia of World's Religions

২. Encyclopaedia of Religion and Ethics (Edt. James Hastings)

৩. The Structure and Pattern of Religion —Gustav Mensching

৪. The Wonder that was India—A. L. Basham

৫. An Introduction to the Study of Indian History —D. D. Kosambi

৬. The Culture and Civilisation of Ancient India —D. D. Kosambi

৭. The Milestones of History Published by—Weidenfeld and Nicolson Ltd.

৮. Art of Indian Asia—Heinrich Zimmer

৯. Sakti and Sakta—Woodroffe

১০. The Serpent Power—Woodroffe

১১. Obscure Religious Cults —S. Dasgupta, M. A. Ph. D.

১২. Cultural Heritage of India, (Vol. 1—6) Published by Ramkrishna Mission, Calcutta.

১৩. Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita —Swami Avedananda

১৪. The Bible

১৫. The Story of Philosophy—Will Durant

১৬ বৈদিক তত্ত্বে ভাষা বিজ্ঞান—হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

১৭. মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (তৃতীয় সংস্করণ)—লেখক

১৮. যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী—অশোক চট্টোপাধ্যায়

১৯. মহেনজোদড়োর লিপি ও সভ্যতা—রাজমোহন নাথ, বি. ই. তত্ত্বভূষণ

২০. Pre-historic India—Stuart Piggot.

২১. The Birth of Indian Civilisation—Bridget and Raymond Allchin

২২. The Fundamentals of Tantra—M. R. Basu

২৩. The Bible—Published by The World Home Bible League

২৪. The Book of Knowledge, Vol. 2. Edt. Gorden Stowell

২৫. An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols —J. C. Cooper
২৬. Christians—C. Lilias Ramsay
২৭. Christianity—Alfred E. Garvie
২৮. Christmas—Kirsopp Lake
২৯. Christmas Customs—Edv. Leh Mann
৩০. Jesus Christ—W. Douglas Mackenzie
৩১. Jesus Christ in Judaism—R. Travers Herford
৩২. Judaism—Herbert Loewe
৩৩. Chosen People : Judaism—David Harley
৩৪. Story of a Nation—Geoffre Cowling
৩৫. Branches of Judaism—Marvin Wilson
৩৬. Developements in Judaism—Geoffrey Cowling
৩৭. The influence of Judaism—Marvin Wilson
৩৮. The Way of the Prophet—Montgomary Watt
৩৯. Mahammad—Lother Schmalfuss
৪০. The Quran
৪১. The Worship of Islam—David Kerr
৪২. The Spirit of Islam—Amir Ali
৪৩. Jesus—Richard France
৪৪. Community of Common Life—Chua Wee Hian
৪৫. Christian Beliefs—Howard Marshall
৪৬. The Bible—Richard France
৪৭. The World of Spirits—Edt. Harold Turner
৪৮. " " Asia—Barbara Boal
৪৯. The World of Spirits Korea—Harvie Conn
৫০. " " Oceania—Alan Tippett
৫১. " " Melanesia—Carl Loeliger.
৫২. " " The Foe of Papua New Guinea—Joan Rule
৫৩. " " The Aborigins—W. H Edwards
৫৪. " " The Maoris—James Irwin
৫৫. " " Madagascar—Alan Rogers
৫৬. " " African Religions—Newell Booth
৫৭. " " The Julu—Axel Ivan Berglund

৫৮. " " North American Indians
J. W. E. Newbery
৫৯ " " The Andes—Leslie
Hoggarth
৬০. " " Gonds—W. Crooke
৬১. The Eternal Teaching of Hinduism—Remond
Hammer
৬২. The Developement of Hindu Religion—Raymond
Hammer
৬৩. The Great Interpreters—Raymond Hammer
৬৪. Concepts of Hinduism—Raymond Hammer
৬৫. Hindu Worship and Festivals—Raymond Hammer
৬৬. Indian Philosophy Vol. I—Dr. Radhakrishnan
৬৭. ঈশ্বর সন্ধানে ভারত—সচ্চিদানন্দ সরকার
৬৮. The Religion of the Gurus—The Sikh faith :
Douglas Davis
৬৯. Sages and Immortals, Chinese Religions—John
Berthrong
৭০. China—Albert M. Hyamson
৭১. A Tapestry of Traditions—
Japanese Religions—Michael Pye
৭২. Unity and Peace—
The Bahai faith—Warner Schiling
৭৩. History of the Arabs—Philip K. Hitti
৭৪. O. D. B. L. Vol I—S. K. Chatterji
৭৫. Translation of Wholy Karan—Mabark Karim Jawhar
৭৬. Kimiaye Sa'dat—Imamm Gazzalli
৭৭. Tahfatul Falasifa—Imam Gaxzalli
৭৮ Muslim Darsaner Mulkatha—M. A. Hosem
৭৯. Sufibad O Sadhana—Dr. Kazı Abdul Murim

লেখকের বক্তব্য

বহু পরিশ্রমের পর 'পৃথিবীর অধ্যাত্মসাধনা ও ভারত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হল। নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি ধর্মকেই বর্তমান গ্রন্থে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরাই এর মূল উদ্দেশ্য, কাউকে ছোট করা নয়। লেখক তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরে মূলত সবাই যে সমান এ কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলামের মত বিশ্বধর্মে অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতা আছে। সে জন্য এই ধর্মগুলি সম্পর্কে লেখক নিজে কিছু না লিখে যাঁরা এ বিষয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের দিয়েই লিখিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও জাপানের ধর্মের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন তাঁরই স্নেহধন্য তরুণ লেখক বিপ্রদাস ভট্টাচার্য এবং ইসলামের উপর তার যথার্থ চরিত্র উদ্ঘাটন করে রচনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সুলেখক ও সুহৃদ জনাব মোবারক করীম জওহর। তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য লেখকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অকৃপণভাবে স্বীকৃত হল। লেখকের মূল উদ্দেশ্য যদি বর্তমান গ্রন্থে সিদ্ধ হয় তাহলে, অর্থাৎ পাঠকও যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম সত্যকে বিচার করতে স্বীকৃত হন তবে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর যে সামান্য ফসল তিনি গ্রন্থাকারে ফলিয়েছেন তা সদর্থে ব্যয়িত হয়েছে বলেই ধরা হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের শুভ কামনা শেষে—

বিনীত

১৫. ১. ৮৯ গ্রন্থকার

বিষয়সূচী

১।	আদিবাসীদের ধর্ম	১—৬২
২।	ভারতের প্রাগার্য ধর্ম	৬২—৬৭
৩।	শিখধর্ম	৬৭—৭৫
৪।	চীনের অধ্যাত্মসাধনা	৭৫—৮৮
৫।	জাপানের অধ্যাত্মসাধনা	৮৮—১৪৭
৬।	বাহাই ধর্মবিশ্বাস	১৪৭—১৪৯
৭।	য়িহুদীদের ধর্ম	১৪৯—১৬৪
৮।	ভারতের আর্য ও হিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৬৪—১৯৭
৯।	খ্রীষ্টান ধর্ম	১৯৮—২৬২
১০।	ইসলামে অধ্যাত্ম-দর্শন	২৬৩—৩১৯

এক

আদিবাসীদের ধর্ম

আদিবাসীদের ডাইনী বিদ্যা, জড়বস্তু পূজা প্রভৃতি লক্ষ্য করে মনে হয় অধ্যাত্মতা বলতে যা বোঝায় এদের তা ছিল না। কিন্তু যদি হৃদয়ের একাগ্রতা দিয়ে বিচার করতে হয় তাহলে বোধহয় এরা সভ্য মানুষের চাইতে অনেক বেশি ধার্মিক। প্রকৃতির সঙ্গে এরা একাত্ম হয়ে বাস করে এবং রহস্যময় সত্তার পরিচয় পায়।

এদের জীবনমরণ প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতি থেকেই আসে ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারী, দাবানল, ভূমিকম্প, ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃতির এই সব শক্তিকে তারা দুষ্ট শক্তি বলে মনে করে। আদিবাসীদের নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে ভিন্ন গোষ্ঠী শত্রু হিসেবে দেখা দেয়, নিজেদের মধ্যেও শত্রু থাকে। মৃত্যু যেন পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করার আগেই অধিকাংশ গোষ্ঠী-মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই জন্যই আদিবাসীরা বড় অসহায় বোধ করে। মনে করে যে, তাদের চতুর্দিকেই রয়েছে শত্রু। এই শত্রু নিশ্চয়ই মানুষের চাইতে শক্তিশালী, সুতরাং এই শক্তিকে খুশি করার জন্য আদিবাসীরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে।

এই আদিবাসীদের ধর্ম তাই যথার্থ ধর্ম, জীবনের জন্য ধর্ম, জীবনকে ধরে রাখার জন্য ধর্ম। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বাস্তব, তবে মানুষ সম্পর্কে ধারণা তেমন উচু নয়। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর এদের নির্ভরশীলতা ছিল একান্ত। মানুষের নিয়ন্তা রূপে যে উর্ধ্বশক্তি রয়েছে, মানুষ যে তার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ এই বোধ তাদের ছিল। ঈশ্বরের তুলনায় মানুষ হল পিঁপড়ের মত।

কোন মঠ মন্দির গীর্জা, সমবেত প্রার্থনাব্যবস্থা, ধর্মপুস্তক বা ধর্মতত্ত্ব নেই বলে অনেকের ধারণা এদের কোন অধ্যাত্ম সাধনাই নেই। কিন্তু সভ্য মানুষ জানে না যে, মঠ মন্দির ধর্মপুস্তক ইত্যাদির মধ্যে ধর্ম নেই। ধর্ম বা অধ্যাত্মতা রয়েছে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের মধ্যে।

আদিবাসীদের ধর্মের মূল কথা এই যে, মানুষের চাইতে শক্তিশালী এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। মানুষ যে একাই সব কিছু তা নয়। দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনার অন্তরালে রয়েছে অদৃশ্য এক শক্তি। কখনও কখনও এই শক্তি সবকিছুর মধ্য দিয়ে

স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়, কখনও বা অস্বাভাবিক কোন কিছুর মধ্যে তাকে দেখা যায়, কখনও বা মানুষের বিশেষ বিশেষ দক্ষতার মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটে। একে আদিবাসীরা সাধারণত বলে থাকে মানা (mana).

কখনও এই একই শক্তি নানা শক্তির আকারে নানা স্থানে নিজেকে প্রকাশ করে। এই নানা শক্তির কোন কোন শক্তি মানুষের বন্ধু, এদের খুশি করার জন্যই প্রার্থনা জানানো হয়, বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন শক্তি হয় শয়তান, মানুষকে নিয়ে খেলে। শক্তির কোন অংশ আবার দৈত্যদানো হিসেবে আবির্ভূত। আদিবাসীরা এধরনের শক্তিকেই ভয় করে সব চাইতে বেশি। এবং সব সময় তাদের এড়িয়ে চলার ও খুশি রাখার চেষ্টা করে।

কোন কোন আদিবাসী আবার নানা দেবদেবী হিসেবেও শক্তিকে কল্পনা করেছে। এরা মানুষের জীবনের নানা পর্যায়ে নানা জিনিস নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন শিকার, চাষবাস, যুদ্ধবিগ্রহ, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। যেমন নাইজেরিয়ার যোরুবা (Yoruba) জাত মনে করে যে, ওগুন (Ogun, আগুন ?) নামে এক দেবতা ধাতবশক্তি (অগ্নি ছাড়া ধাতবশিল্প সম্ভব নয়) ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করেন।

যারা শক্তির নানা গুণকে দেবদেবী হিসেবে দেখেছে, তারা তার এক এক মূর্তির জন্য এক একটি মন্দির বা থান তৈরি করেছে। সে-জন্য পুরোহিতও রেখে দেওয়া হয়েছে। রীতিমত অনুষ্ঠানও হয়।

অনেক আদিবাসীর ধর্মে নানা শক্তির ঊর্ধ্বে এক প্রধান শক্তির কল্পনাও আছে। কখনও কখনও তাকে বিশ্বের সকল মানুষের পরমেশ্বর হিসেবে ভাবা হয়। উত্তর আমেরিকার ভারতীয়রাই (Red Indians) এমন ভাবত। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা (Maoris) এঁর নাম দিয়েছে আইও (Io)। তিনিই বিশ্বের সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের নৈতিক জীবন যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তিনি সেই রকম চিন্তা করেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে অধীনস্থ দেবতাদের মাধ্যমে। আদিবাসীদের বিশ্বাস, তিনি ক্রুদ্ধ হলে মানুষের কাছ থেকে সরে যান, কিংবা তিনি এতই রহস্যময় ও দুরধিগম্য যে, মানুষ তার হদিসই করতে পারে না। এই পরমেশ্বর 'আকাশ-দেবতা' হিসেবেই কল্পিত। এঁর কোন মঠ মন্দির, পুরোহিত, বলিদান প্রথা ধর্মব্যবস্থা এ-সব নাও থাকতে পারে [ভারতের সাধনায়ও এ-সব নেই, এ সাধনা গুহ্যসাধনা, যোগসাধনা। অত্যন্ত রহস্যময়] এই দেবতার উদ্দেশে কোন বলি দেবারও প্রয়োজনও নেই।

আদিবাসীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা থেকে যায় [হিন্দুরাও নির্বাণপ্রাপ্ত বা সমাধি-প্রাপ্ত উচ্চ কোটির সাধক ব্যতীত আর সকলেরই মৃত্যুর পর জীবাত্মা রূপ অস্তিত্ব থাকে বলে বিশ্বাস করে। এবং এ ধারণা যে কত সত্য ভারতের বামাচার তন্ত্রসাধনায় সূক্ষ্ম জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান হলেই তা জানা যায়। যোগ-তন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। এই সব মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। সেই জন্যই আদিবাসীরা মনে করে যে, প্রাক্তন মৃত পুরুষদের আত্মার পুজো করা উচিত। তাঁরাই উর্ধ্বস্তরের দেবতা ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এঁরা যে যথার্থই দেবতা হিসেবে পূজিত হন তা নয়। এরা আসলে কয়েক পুরুষ ধরে অধস্তন পুরুষদের শ্রদ্ধালাভ করে থাকেন।

আদিবাসীদের ধর্মের উৎস কতকগুলি অদ্ভুত গল্প, যেগুলো (Myth) বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। এই সব গল্প যে পরীর গল্প (Fairy Tales) তা নয়। এই সব গল্পের মধ্যেই আদিবাসীদের ধর্মতত্ত্ব ও জীবনদর্শন রয়ে গেছে। এই সব গল্পের মধ্যে মনুষ্য চরিত্রের অন্তরতম সত্তা সম্পর্কে একটা বোধ এবং মানুসের সমস্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

যে-কোন ব্যক্তি গভীর ধ্যানে এই অতীন্দ্রিয় শক্তির দর্শন লাভ করতে পারে বা তাঁর সম্পর্কে অনুমান করতে পারে। কখনও কখনও এই অতীন্দ্রিয় শক্তি মানুষের উপর ভর করে তার মধ্য দিয়ে রহস্যময় সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে। কখনও বা স্বপ্নের মধ্যে এই শক্তি মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়। যখন স্বপ্নকে অস্বাভাবিক মনে হয়, অথচ স্পষ্ট সে স্বপ্ন সম্পর্কে মনে থাকে, তখনই বিভ্রান্ত স্বপ্ন-দর্শক অপরের কাছে তার ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করে, মিশরের ফেরাও যেমন যোশেফের কাছে স্বপ্নের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন।

অতীন্দ্রিয় জগৎ ও ইহজগতের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কতকগুলি অনুষ্ঠানকেও আদিবাসীরা মূল্য দেয় (আমরাও দিয়ে থাকি)। এই আনুষ্ঠানিকতা ও রহস্যময় গল্পকথা (Myth) মিলে আদিবাসীদের মধ্যে এমন এক পূজাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে যা রীতিমত জটিল। এই সব পূজাপদ্ধতি বা অনুষ্ঠানে আদিম সেই গল্পগুলিকে (Myth) অভিনয় করে দেখানো হয়, যাতে লোকে সেই গল্পগুলিকে সত্য বলে ভাবতে পারে। এ ধরনের অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উৎসবগুলির মধ্যে একটি হল নববর্ষ উৎসব। নববর্ষে যেন পুরানো, বৃদ্ধ, ক্ষয়ে যাওয়া ও দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবী নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে, সৃষ্টির ঊষালগ্নে তার যেমন আবির্ভাব হয়েছিল

ঠিক তেমনি। এ-ধরনের উৎসবের একটি হল পুরানো প্রদীপ বা মশাল নিভিয়ে নতুন মশাল প্রজ্জলিত করা। অনেক আদিবাসী সারাবছর গ্রামে মশাল জ্বালিয়ে রাখে। নতুন বছর এলে সেই মশাল নিভিয়ে ফেলে পাথর ঠুকে নতুন মশালে আগুন জ্বালে। অর্থাৎ এর দ্বারা নতুন সৃষ্টির অভিনয় করে, মানুষকে বোঝাতে চায় যে, দেবতারা কিভাবে প্রথম অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন। এ-সব অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদ নাচগানও হয়। তবে এর একটা গূঢ়ার্থও থাকে। এর দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা হয় যে, মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ, তার নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস থেকে নবপ্রাণ সঞ্চার করা প্রয়োজন।

আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে প্রার্থনা, বলিদান ও অর্ঘ্যদান বেশ বড় রকমের একটা স্থান জুড়ে আছে। সভ্য মানুষের সুসংহত ধর্মের মধ্যেও এ ভাব দেখা যায়। কোন কোন অনুষ্ঠান আবার রীতিমত আত্মকেন্দ্রিক—সেখানে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সব আদিবাসীই যে বলিদান করে তা নয়, তবে অনেকেই সূচীমাফিক বলিদান, দগ্ধকরণ, জলদান, খাদ্যদান ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করে।

আদিবাসীদের এক ধরনের বদ্যি বা ওঝা আছে। তিনি একাধারে বৈদ্য, পুরোহিত, গণৎকার, গুণিন, জাদুকর সব। পুরোহিতরা পূজার থানগুলির তদারক করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এঁদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শক্তির ভর হয় বলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। গণৎকার হিসেবে এরা কোন ঘটনা দেখে ভাল বা মন্দ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। নানা ঘটনা থেকে তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা ইঙ্গিত কি তা বলে দেয়। এরা কখনও কখনও দিব্যভাবে অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করতে পারে বলেও বিশ্বাস [Astral travel of the Indian yogis—ভারতীয় যোগীদের সূক্ষ্মদেহে আকাশ পরিক্রমা, তন্ত্রের ভাষায় কূটস্থান পরিক্রমা।] সেই সময় তারা রহস্যময় জ্ঞান লাভ করে।

এ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতালাভের জন্য দীর্ঘদিন অভ্যাসের প্রয়োজন। তবে আদিবাসীদের বিশ্বাস, জন্মের সময় বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে না জন্মালে এ বিদ্যা আয়ত্ত হয় না। কখনও কখনও ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর প্রত্যাদেশ হলেও লোকে এ-ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে দেখা যায় যে, মানুষ ক্ষমতাশালী হলেও মূলত জগৎ নিয়ন্ত্রণের ভার ঈশ্বরের হাতে—আদিবাসীরা সেই তত্ত্বে বিশ্বাস করে।

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাপে বহু আদিবাসী-ধর্ম মরে গেছে। তবে এখনও নানা স্থানে কিছু কিছু আদিম অধিবাসী যুগপরম্পরায় তাদের পুরানো ধর্মবিশ্বাসই আঁকড়ে আছে। কিন্তু তাই বলে তাদের আদিম ধর্মবিশ্বাস যে

কুসংস্কার মাত্র তা বলা চলে না। আদিবাসীদের সরল মনের একাগ্রচিত্তভাব তাদের কাছে এমন সব অতীন্দ্রিয় সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে যে, অতীন্দ্রিয়ের যথার্থ রূপ তারাই অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সভ্য মানুষ নয়। অদ্যাবধি যে সব আদিবাসী-ধর্ম টিকে আছে সে সব ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা করলেই উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে। এ-সব ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন,

(১) **এশিয়া:** এশিয়ার উপজাতীয় আদিবাসীরা অতীন্দ্রিয় ও বস্তু জগৎকে খুব একটা পৃথক করে দেখে না। কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের ধর্মতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। এরা অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্কে বিশ্বাস করে। তাদের মতে এই দুইকে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ও বস্তুজগৎকে পৃথক করা চলে না। প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীই তার পরিবেশ অনুসারে ধর্মবোধ গড়ে তুলেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে শৃঙ্খলা ছিল (গুণসাম্য) সেই শৃঙ্খলা সমাজের মধ্যে রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য।

সাইবেরিয়াতে অধ্যাত্মজীবন পরিচালনা করে শমনেরা (শ্রমণ?)। ভালমন্দ সব কিছুর উর্ধ্বেই একজন প্রধান দেবতা বা ঈশ্বর আছেন এ তত্ত্বে তারা বিশ্বাস করে। শমনেরা (মহিলা ও পুরুষ উভয়েই) মনে করে যে, অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে তারা এই শমন-এর কাজ চালাবার দায়িত্ব লাভ করে। এজন্য তাদের রীতিমত এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারা নিবিড় তন্ময়তায় অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে (যে জিনিস ভারতীয় যোগীরা কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্বোধনের সাহায্যে লাভ করে থাকেন।) অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে সেখান থেকে তাঁরা মানুষের ভুলভ্রান্তির প্রতিকার সম্পর্কে জেনে আসে। তাঁরা মানুষ ও অতীন্দ্রিয় এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল ছন্দ স্থাপনের জন্য প্রয়াস পান। এই যে শৃঙ্খলা, সাম্য, এটাই তাদের অধ্যাত্মসাধনার মূল কথা। উত্তর জাপানে আইনুস (Ainus) ও তাইওয়ানের পার্বত্য অধিবাসীরাও অনুরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বেই বিশ্বাস করে থাকে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাস এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা প্রাচীনতম এশিয়াবাসীদের ধর্ম-সাধনার ঐতিহ্যই অদ্যাবধি বহন করে আসছে। বর্তমানে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কেউ আছে অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যদেশে, যেমন মধ্য ভারতের পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ ভারতে ও ছোটনাগপুরে আদিবাসী ও আদিম অধিবাসী, আধুনিক কাম্পুচিয়ার নিবিড় অরণ্য ও উপকূলীয় জলাভূমির আদিবাসী প্রভৃতি। এদের

মধ্যে মালয় উপদ্বীপের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের সেমাং নেগ্রিটো (Semang Negrito) ও তাদের প্রতিবেশীরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিলিপিনের ইটাস নেগ্রিটো, মিনডানাও মিনডোরো (Aetas-Negrito, Mindanao Mindoro)-দের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্য বোর্নিওর কালিমানটাং সেলেবিস (Kalimantang Celebes) ও পূর্ব সুমাত্রার যাযাবরদেরও এর মধ্যে টেনে আনা যেতে পারে।

এই সব যাযাবর গোষ্ঠীর কোন কোনটা শুধু বা একটি পরিবার নিয়ে, কোনটা বা কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত। খাদ্যাভাবের জন্য এদের তেমন বংশবৃদ্ধি হয়নি। তবে যাযাবরের মত যতই তারা ঘুরে বেড়াক না কেন নিজেদের গণ্ডীর বাইরে কখনও যায় না। এরা খাদ্যসামগ্রী নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে খায়। এদের খাদ্য হল গাছের মূল, পাতা, ফল, মাছ প্রভৃতি। তীর ধনুক দিয়ে ছোট ছোট শিকার মেরেও খায়। তবে মালয় উপদ্বীপের সেমাং (Semang রা ব্লো-গান (Blowgun. ফুঁ দিয়ে ঢিল ছোড়ার নল) ও বিষাক্ত তীরও ব্যবহার করে।

এইসব উপজাতীয়দের মূল বাসস্থান ও স্থানীয় উৎপাদনেরও একটি ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। যেখানেই তারা ঘোরাফেরা করুক না কেন মাঝে মাঝেই তারা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে আসে। মালয়েশিয়ার সেনোই (Senoi) অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরা কখনও স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে না। খাদ্য সংগ্রহের সময় তারা সাময়িক বাসস্থানে গড়ে তোলে। তবে চাষবাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের আস্তানা আছে। সেখানে বছরের একসময় তারা জড় হয়।

অনেকগুলি বিষয়ে এদের স্পর্শকাতরতা আছে। কিছু কিছু গাছ কেটে ও পুড়িয়ে তারা শস্যক্ষেত্র তৈরি করে। তার পর ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এ অনুষ্ঠান শস্য কেটে গোলাজাত না করা পর্যন্ত চলতেই থাকে। গোষ্ঠীভুক্ত সব মানুষই এই অনুষ্ঠান করে। গোষ্ঠীভুক্ত সকল মানুষই শস্য রোপণের প্রথম দিন ব্রহ্মচর্য পালন করে অর্থাৎ যৌনসম্পর্ক পরিত্যাগ করে চলে। গোষ্ঠির কোন এক ব্যক্তির অসুখ করলে সকলেই তাতে জড়িয়ে পড়ে, কারণ, তারা মনে করে যে, রুগ্ন ব্যক্তির আত্মা তাদের গোষ্ঠী ত্যাগ করে গেছে, তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। রোগ নিবারণের জন্য শমনেরা এমন কিছু লতাগুল্ম ব্যবহার করে যেগুলি দুষ্টশক্তির কাছে অপ্রিয়। উদ্দেশ্য, দুষ্টশক্তি আক্রান্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করুক।

কারো অসুখ যদি খুব গুরুতর হয় গোষ্ঠীর লোকেরা কতকগুলি বিধি নিষেধ পালন করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে, দিন রাত গান ও নৃত্য চলে [আমাদের অষ্ট প্রহরের মত, বা হরি সংকীর্তনের মত, বা নীচু শ্রেণীর লোকেরা যেমন অনাবৃষ্টির সময় বুক চাপড়ে রোদনাতুর গান গায় সেই রকম]। শেষ পর্যন্ত দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়ে অর্থাৎ রক্ত দিয়ে দুষ্টশক্তিকে বিতাড়িত করা হয়। রুগী মারা গেলে রোগের সংক্রামকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরও কিছু বিধিনিষেধ পালন করা হয়। [ভারতের বিহার প্রদেশে এই সেদিনও গুটি রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অদ্ভুত এক বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত যে, রুগীর উপর মায়ের (শীতলা মাতা) ভর হয়েছে। সেই জন্য তারা তাকে ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করত এবং রুগীর ঘর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত। রুগীর ভুক্তাবশেষ তারা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করত]

মৃত্যু আদিবাসীদের কাছে জন্মেরই মত একটা ভয়ানক ব্যাপার [যেমন ভারতীয় হিন্দুরা আজও নবজাতক এলে বা কারো মৃত্যু হলে নির্দিষ্ট দিনের জন্য অশৌচ পালন করে]। গোষ্ঠীর লোকেরা তখন পৃথক হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য নিজেদের এবং প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাদের বিশ্বাস যে, বিধিনিষেধ ভাঙলে ভয়ানক ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দেবে। এই ঝড়ঝঞ্ঝা পাঠান ঈশ্বর বা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা।

যাযাবরদের মধ্যে দেবতাদের উঁচু নীচু স্তর সম্পর্কে ধারণা কম আছে। প্রাক্তন পুরুষদের আত্মা যে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে এ সম্পর্কেও ধারণা খুব অস্পষ্ট। এরা নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য একসঙ্গে মিলে মিশে চলার উপর বিশেষ জোর দেয়। যে সকল উপজাতি বা আদিবাসীর সামাজিক গঠন জটিল, এবং যাদের অর্থনীতি কিয়দংশে উন্নত, তাদের আনুষ্ঠানিকতাও তত প্রবল। এজন্য অনুষ্ঠান-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

ওড়িশার পূর্বঘাট অঞ্চলের অরণ্যাবৃত স্থানের কণ্ড বা 'কুই'রা—যাযাবর ধরনের জীবনযাপন করে। তারা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করে চাষ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করে। অনাবৃষ্টি বা খরার ফলে খাদ্যাভাব ঘটলে ফল কুড়িয়ে ও শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে এখন ধান চাষের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কণ্ডরা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও মনুষ্য বলি দিত। এই বলি দেওয়া হত পৃথিবী-মাকে খুশি করার জন্য। মানুষ, দেবতা ও পৃথিবী মায়ের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই এই বলির ব্যবস্থা ছিল। মনুষ্যরক্ত পেলে পৃথিবী মাতা তাঁর উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করেন এ বিশ্বাসও ছিল।

এই যাযাবরদের মধ্যে বা আদিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীমাতা সম্পর্কে এক অদ্ভুত গল্প আছে। সৃষ্টি দেবতা বুরা (Bura) পৃথিবী মা তারি (Tari)-কে সৃষ্টি করেন। তবে 'তারি' স্ত্রীর কর্তব্য তেমন পালন করতেন না। তারি বুরাকে জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করতে বারণ করেছিলেন। বুরা তবু জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিতে সবই হয় স্বর্গতুল্য। কিন্তু তারি এই সৃষ্টির উপর অদ্ভুত এক বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন। এর ফলে বুরা ও তারির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। স্বল্প সংখ্যক কণ্ড বাদে আর সবাই বিশ্বাস করে যে, শেষ পর্যন্ত তারিরই জয় হয়েছিল। তবে বুরাকে তিনি একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। দেবতা হিসেবে দ্বিতীয় স্থান দেন। তারি মানুষকে শিকার করা, যুদ্ধ করা ও চাষবাস শেখান। তবে বিনিময়ে মনুষ্য বলি দাবি করেন। [এই গল্পের সঙ্গে খুটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তন্ত্রের হং-স-এর বিরাট যোগ আছে। শ্বাস (হং) হল পুরুষ, প্রশ্বাস (স) হল নারী। শ্বাসে লয়, প্রশ্বাসে সৃষ্টি। সৃষ্টি প্রকৃতিভুক্ত, অর্থাৎ স্ত্রী-শক্তিভুক্ত। ফলে সৃষ্টির উপরে তারির জয় হয়েছে এ কথাই বলা চলে। কণ্ডদের এই গল্পকে চীনের তাওবাদের ইয়াং ও ইনের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে।]

তারির (Tari) পূজা কণ্ডদের মধ্যে এখনও আছে। তবে এখন আর মনুষ্য বলি হয় না, মোষ বলি দেওয়া হয় [Tari কি মহিষমর্দিনী দুর্গা ? চণ্ডীতে যিনি সর্বোত্তমা, যার উপর আর কেউ নেই ?]। বলি দেওয়া মোষের মাংসের কিছুটা নিজেদের গ্রামের এবং কিছুটা পুঁতে দেওয়া হয় প্রতিবেশী গ্রামের মাটিতে। উদ্দেশ্য মাটি-মাকে খুশি করে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা। আগে কণ্ডদের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ লেগেই থাকত। তবে এই অনুষ্ঠানের সময় সাময়িক শান্তি থাকত। যে-কয়দিন বা বছর এই অনুষ্ঠান চলত এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত। কোন কোন জেলাতে আজও বাৎসরিক এই উৎসব হয়ে থাকে। অনেক সময় চাষবাসের সময় বা রোগ-মহামারী দেখা দিলেও এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা তারির উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। এই পুজোর সময় কণ্ডদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

কণ্ডরা কখনও কখনও যে মনুষ্য বলি দিতে যে অস্বীকার না করত তা নয়। তারা মরণপণ করেও মনুষ্য বলি দেওয়া থেকে বিরত থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দিলে আবার নতি স্বীকার করে মনুষ্য বলি দিত। [মনুষ্য বলি বা যে-কোন পশু-বলি যে অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে রীতিমত অযৌক্তিক ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর গূঢ় তাৎপর্য আদিম

মানুষ ধরতে পারেনি বলেই জলজ্যান্ত একটি মানুষকে বলি দিত। আসলে মানুষ বলি দেওয়ার অর্থ, মানুষের অহংকারকে বলি দেওয়া। পাশ দ্বারা বদ্ধ পশু অর্থাৎ মানুষের পাশ ত্যাগ করা। এর যথার্থ অর্থ বুঝতে না পেরে মানুষকেই বলি দেওয়া হত। অতীন্দ্রিয় নির্দেশের এরকম ভুল ব্যাখ্যা অনেক হয়। প্রাচীনকালে যখন ইরানীরা গ্রীস আক্রমণ করে তখন এথেনীয়রা দৈববাণী শুনেছিল যে, সমগ্র গ্রীস ইরানীদের পদানত হবে। শুধু এথেন্সের কাঠের দেয়াল বাঁচবে। এই সাবধান-বাণীর যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পেরে কিছু সংখ্যক এথেন্সবাসী শহরের কাঠের দেয়ালের আড়ালে থেকে গিয়েছিল। তবে অধিকাংশই নৌকোতে আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রে ভাসমান হয়েছিল। এথেন্সের কাঠের দেয়াল ধ্বংস হয়। যারা এই দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল তারা মারা যায়। কিন্তু যারা নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা বেঁচে যায়। শুধু বেঁচে যায় না, এই নৌ শক্তির সাহায্যেই এথেন্স ইরানীদের পরাজিত করে। আসলে এথেন্সের কাঠের দেয়াল ছিল তার নৌকো। দেয়াল আত্মরক্ষার জন্য। কাঠের নৌকোগুলি এথেনীয়দের বাঁচিয়েছিল। সুতরাং ঐ কাঠের নৌকোগুলিই ছিল যথার্থ দেয়াল। যারা এর সঠিক অর্থ ধরতে পারেনি তাদের জীবন দিয়ে খেসারৎ দিতে হয়েছিল। তেমনি প্রাচীন গল্প ও পুরাণ কাহিনীর যথার্থ তাৎপর্য যারা বুঝতে না পারে তারা ভুল করে, এবং ভুলের জন্য খেসারৎ দিতে বাধ্য হয়।]

কণ্ডরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে কল্যাণ সাধন করতে চাইত। যেমন

১। চাষবাস সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

২। পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ ও সাহায্য পাবার জন্য অনুষ্ঠান।

৩। অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার জন্য নানা বিধিনিষেধের অনুষ্ঠান।

৪। নিরাপত্তা ও জীবনরক্ষার জন্য অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানগুলি সকল আদিবাসীর মৌলিক অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসরণ করে চলত।

কণ্ডদের মধ্যেও বদ্যি, ওঝা বা গুণিন আছে। এরা অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। গুণে গুণে বলতে পারে কে কার ভাল বা মন্দ করছে। এদের পুরোহিত বা গুণিনরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে ও বলি দেয়। বলি দেয় মুরগী, ছাগল, শূকরছানা, মোষ ইত্যাদি। গ্রামে গ্রামে যে থান আছে সেই থানের দৈবনির্দিষ্ট কিছু পুরোহিত আছে। তারা এখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠান করে। অনেক গ্রামে দেবতাদের আশ্রয় হিসেবে পবিত্র কুঞ্জ আছে। এখানে পর্বত-দেবতা বা

গ্রামরক্ষক দেবতারা থাকেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করে থাকে। এরা এদের অভিজ্ঞান হিসেবে সাপ বা অন্যান্য পশুর ব্রোঞ্জ মূর্তি ঘরে রেখে তার পুজো দেয়।

কণ্ডরা প্রাক্তন পুরুষ, বর্তমান পুরুষ ও অনাগত পুরুষ সবাইকে নিয়েই তাদের গোষ্ঠী সমাজের কল্পনা করে। রীতিমাফিক নিত্য অনুষ্ঠানকর্মও করতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হলে এবং যথোপযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্মাদি হলে মৃত আত্মা পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে কণ্ডরা এমন বিশ্বাস করে। অনেক সময় মৃত আত্মা মাকড়শার আকারেও ঘরে ফিরে আসে বলে এদের মধ্যে বিশ্বাস আছে। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির আত্মাকে প্রাক্তন পুরুষেরা গ্রহণ করতে চান না বলে কণ্ডরা মনে করে। [অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু জীবাত্মার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই হয় বলে সে কর্মফলের দ্বারা ঊর্ধ্বগতি লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সূক্ষ্ম জগতের নিচু স্তরে অর্থাৎ নরকে থাকে, এ বিশ্বাস হিন্দু যোগীদেরও আছে।] ফলে দুর্ঘটনায় মৃত আত্মা একাকী ঘুরে বেড়ায়। কণ্ডরা মনে করে যে, জীবিতকালে যেমন সমাজে সকলে মিলেমিশে থাকে মৃত্যুর পরও প্রাক্তন পুরুষেরা তেমনভাবেই বসবাস করে। কণ্ডদের কাছে পরলোকে জীবাত্মার স্থান তার ভাল মন্দ কর্ম দ্বারা স্থির হয় না, হয় কিভাবে মৃত্যু হয়েছে, তার দ্বারা।

উত্তর লুজনের (Luzon) পার্বত্য প্রদেশের বোনটক (Bontocs) ও কলিঙ্গদেরও (Kalingas) কণ্ডদের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার অনেক পার্থক্যও আছে।

বোনটকদের কাছে গ্রামই হল জীবনের কেন্দ্র। বড় বড় গ্রামগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগে গণপরিষদ আছে। একটি ঘেরাও করা উঁচু পাথরের মঞ্চে তাদের সভা বসে। সামাজিক, আনুষ্ঠানিক, রাজনৈতিক সব কিছুরই কেন্দ্রস্থান হল এই পাথরের মঞ্চগুলি। মুণ্ড শিকার অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে এখান থেকেই আরম্ভ হয় আবার এখানেই শেষ হয়। কেউ পরিষদের সদস্য হতে পারবে না যতক্ষণ না একটি মুণ্ড শিকার করে বসবার পাথরের নিচে সেটা পুঁততে পারবে। এদের বিশ্বাস, যার মুণ্ড শিকার করা হয় তার জ্ঞান শিকারীর সঙ্গে যুক্ত হয়। সামাজিক মর্যাদা বোনটকদের মধ্যে একটা বড় ব্যাপার। এ মর্যাদা বড় বংশে জন্মালেও পাওয়া যেতে পারে বা কে কতগুলি মোষ বলি দিয়ে বড় বড় ভোজ দিতে পেরেছে তার উপর নির্ভর করে। বাড়িতে ঢোকার মুখে কে কয়টি মোষের শিঙ রাখতে পেরেছে সেটা একটা বড় কথা। এ দেখে দেবতা অপদেবতা এবং

মানুষ সকলেই গৃহকর্তার বলিদানের পরিমাণ অনুমান করে সেই অনুপাতে তার মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে।

কণ্ডদের সঙ্গে বোনটকদের মিল এই যে, এদের মহিলারাও গণ-প্রতিনিধি সভাতে বসতে পারে না। তবে এদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। এদের জীবনের আর একটি বড় ব্যাপার এই যে, যুবক-যুবতীদের জন্য বহু শয্যা বিশিষ্ট শয়নগৃহ আছে। বিবাহের পূর্বে সেখানে তারা স্বাধীনভাবে মিলিত হতে পারে।

সন্তানহীনতা বোনটকদের কাছে অভিশাপস্বরূপ। দেবতারা এতে সন্তানহীন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট এমন প্রমাণ হয়। পূর্বপুরুষেরাও এতে অসন্তুষ্ট হন বলে ধারণা। এর ফলে দাম্পত্য জীবনেও বিচ্ছেদ ঘটে। এরা পবিত্র দেবকুঞ্জ বা ঝোপে বিশ্বাস করে।

[বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবনেও এ ধরনের একটি পবিত্র কুঞ্জ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এখানে একদল দেবী বাস করতেন। এখনও এখানে প্রতিবছর বৃন্দাদেবীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা, এই বৃন্দা নাম্নীয় দেবী বা দেবীদের সঙ্গে মানুষের বিবাহ হলে বৎসরান্তে তাকে বলি দেওয়া হত এবং এই দেবী বা দেবীগণ আবার প্রতিবছর নতুন বিবাহ করতেন। কৃষ্ণ এদের জয় করে এই রীতি ভঙ্গ করেন। কিন্তু প্রতীকী সেই বিবাহ অদ্যাবধি কৃষ্ণের সঙ্গে তার বাৎসরিক বিবাহানুষ্ঠানে সম্পন্ন হয়।]

স্ত্রীপুরুষ সবাই বোনটক ও কলিঙ্গদের মধ্যে গণৎকার বা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে পারে। সমগ্র চাষবাসকালে এরা নানা অনুষ্ঠান করে উর্বরাশক্তির দেবদেবীর কাছ থেকে শস্য আদায়ের চেষ্টা করে।

বোনটকরা কণ্ডদের অপেক্ষা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ ঘটনায় বিশ্বাস করে। পাখির ওড়া, পতঙ্গের চাল-চলন, পশুর অন্ত্র, মুরগীর ডাক বা নীরবতা—এই ধরনের নানা জিনিস দেখে এরা ভবিষ্যতের শুভ অশুভ বিচার করে। [এখনও এ-সব বিশ্বাস আমাদের মধ্যে টিকে আছে, যেমন হাঁচি, টিকটিকির শব্দ, সর্পের গতি, শেয়ালের গতি এ-সব দেখে আমরা কোন কাজে যাত্রার আগে তার ফল শুভ বা অশুভ হবে বিচার করি]। বোনটকরা পাথরঘেরা শূয়রের খোঁয়াড়কে পবিত্র বলে বিবেচনা করে। কণ্ডরা কিন্তু শূয়রকে নোংরা বলে ভাবে। আধিব্যাধি দূর করার সময় বোনটকরা শূয়র বলি দেয়। মেয়েদের কাছে শূয়র তল অচ্ছুৎ।

তবে কণ্ড ও বোনটক সকলের কাছেই পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট মূল্য আছে। বোনটকরা পূর্বপুরুষদের পোড়ায় না। মৃত্যুর পর এরা চেয়ারে বসিয়ে মৃতদেহ সম্পর্কে নানা

অনুষ্ঠান করে, তারপর কোন গিরিখাদের গহ্বরে রেখে দিয়ে আসে। প্রতিবছর সেখানে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য সম্মান জ্ঞাপন করে আসে।

মুণ্ডশিকার বোনটক ও কলিঙ্গদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হওয়াতে প্রতিবেশিদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই থাকত। এখন অবশ্য মধ্যস্থা করে বড় বড় সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা হয়। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা গ্রাম-সমাজ পরিচালনা করেন। এ ব্যাপারে চিরাচরিত নিয়মকানুনগুলিকেই অনুসরণ করা হয়।

কলিঙ্গ ও বোনটকদের ধর্মের সঙ্গে সামাজিক 'মর্যাদা-ভোজও' জড়িত। ধেনো মদ বা আখের রসের কড়া মদ তৈরি করা হয়। দেবতা ও মানুষ সকলেরই তা পানীয়। পাহাড়ী দেবতাদের খুশি করার জন্য এই মদ ও মুরগী বা শূয়র তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনেক পরিবার রোগমুক্ত বা বিপদমুক্ত হবার জন্য অপদেবতা বা দেবতাদের খুশি করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ভোজ দেবার জন্য এত মোষ বলি দেয় যে, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ঋণ হয়তো বংশপরম্পরায় শোধ করা হয়।

বর্তমানে বোনটক ও কলিঙ্গদের মধ্যে আধুনিক ধ্যান ধারণা প্রবেশ করে বহু প্রাচীন প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছে।

(২) **কোরিয়ার আদিবাসী ধর্ম-সাধনা** : কোরিয়ার ঐতিহ্যময় ধর্মের নাম সিনকিও (Sinkyo)। এর যে যথার্থ অর্থ কি কেউ তা জানে না। তাই পণ্ডিতেরা একে বলেন নামহীন ধর্ম। কোরিয়াতে যে সুনির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় রূপরেখা আছে তা নয়, তা ছাড়া এক ধরনের বিশ্বাসও নেই। এদের ধর্ম সাধনাকে পণ্ডিতেরা বলেন animism অর্থাৎ জড় ও প্রাকৃত পদার্থে প্রাণ আরোপবাদ। প্রত্যেক ধর্মের মতই এদের ধর্মেরও পাঁচটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য করার দিক আছে। যেমন—

(ক) মানুষকে এরা বিশ্বছন্দের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে। [ভারতীয় তন্ত্রেরও এটা মূল কথা। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যেমন গুণসাম্যে রক্ষিত, মানুষেরও জীবনও তেমনই গুণসাম্যেই স্থির থাকে।] এরা মনে করে যে, প্রকৃতির শক্তিই মানুষের জন্ম, মৃত্যু, ভূমির উর্বরতা, অনুর্বরতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রাকৃতিক শক্তিকে এরা দেবতারূপে কল্পনা করে [ভারতের আর্যরাও তাই করতেন]। সমগ্র বিশ্বজগতের সর্বত্রই এই প্রাকৃতিক শক্তি—স্বর্গীয় শক্তি, মৃত্তিকার শক্তি, জলশক্তি, বৃক্ষশক্তি, ইত্যাদি আকারে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বজগৎ এই শক্তির এক লীলাভূমি। [ভারতীয় তন্ত্রে এই বিশ্বজগৎ মহামায়া নিজে। সত্যকে আচ্ছন্ন করে জীবজগতে তিনিই বিদ্যমান আছেন।]

(খ) কোরীয় আদিবাসীরা মনে করে যে, জগতের ঋতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের তানগুন (Tangun) দেবতাকে নিয়ে পৌরাণিক কাহিনীও আছে। এই তানগুনই কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। গল্প আছে যে, স্বর্গের পুত্র উঙ (Ung) একটি ভালুককে নারীতে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু সেই রমণী তার কোন স্বামী খুঁজে পায় না। উঙ তখন নতুন দেহ ধারণ করে তাকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করেন। এই সন্তানের নাম তানগুন (Tangun)। কোরীয়রা একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এই দিনটি আজও পালন করে। একে বলে কায়েচ ওনজোল (Kaech'onjol)। প্রবীণ আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের আরও গল্প প্রচলিত আছে। এদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ নিয়েও নানা কাহিনী রয়েছে।

(গ) ভাগ্য সম্পর্কে কোরীয়রা কনফুসিয়াসপূর্ব চৈনিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। স্বর্গ, মানুস ও প্রকৃতির মধ্যে একটা বিপরীত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। সৃষ্টি এই দুই বিপরীত শক্তির সাম্যের মধ্য থেকে উদ্ভূত। এই দুই বিপরীত শক্তির নাম ইন ও ইয়াং (স ও হং বা হং ও স-এর মত)। ইন হল শূন্যতা, নির্গুণ, দুর্বল ও ধ্বংসাত্মক। ইয়াং হল সগুণ, সক্রিয়, শক্তিময় ও সৃজনশীল। [ভারতীয় তন্ত্রে yin হলেন শিব, নির্গুণ পুরুষ, yang কালী প্রকৃতি। কিন্তু কোরীয়রা yin-কে বৌদ্ধ প্রজ্ঞার মত স্ত্রীরূপে ভাবে, চণ্ডীর দুর্গার মত। Yang-কে ভাবে পুরুষ বলে।] এই দুই বিপরীত গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একটা সাম্য আছে। কখনও তা সৃষ্টরূপে ফুটে উঠে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের সৃষ্টি এই দুই বিপরীতের মধ্য থেকেই হয়েছে। ইন হলেন মা, কোমল, নরম, আর্দ্র। ইয়াং হলেন পুরুষ, শক্তিমান, পিতা, কঠিন, উজ্জ্বল [যেন ভারতীয় তন্ত্রের পুরুষের ব্রহ্মজ্যোতি]। এই দুই বিপরীত গুণকে তারা অদ্ভুত রেখাচিত্রের মধ্যে ধরে রেখেছে, আমরা যেমন রেখেছি কালী মূর্তিকে। মানুষ কোথায় বাস করবে তার মধ্যেও কোরীয়রা এই বিপরীতের গুণসাম্য খুঁজে দেখে। অর্থাৎ এমন জায়গা খুঁজে, যার মধ্যে বিপরীতে সাম্য রয়েছে। ইয়াং-ইন-এর কার্য পদ্ধতি অনুসারেই তারা গৃহ বা সমাধি সব কিছু নির্মাণ করার চেষ্টা করে। এই সাম্য তারা গৃহ বা কবর নির্মাণের ক্ষেত্রে পাঁচটি উপাদানের সাম্যের ভেতর ধরতে চায়, যেমন, কাঠ, ধাতু, আগুন, জল ও মাটি। এদের পারস্পরিক ক্রিয়ায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে তারা লক্ষ্য রাখে।

(ঘ) পৃথিবীতে বিপরীতের মধ্যে গুণসাম্য রক্ষা করে চলা কঠিন কাজ। কাজেই মাঝে মাঝেই সাম্যের ভেতর অসাম্য দেখা দেয়। সিনকিও অর্থাৎ কোরীয় ধর্ম

এ-ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তি নিয়ে চিন্তা করে। ধান চাষের সময় এরা পৃথিবীর উর্বরা-শক্তিকে খুশি করার জন্য আনুষ্ঠানিক নৃত্য-গীতের আয়োজন করে। [আমাদের দেশে নীচু শ্রেণীর মানুষেরা, বিশেষ করে মহিলারা সূর্যপূজার সময় এমনই নৃত্য গীত পরিবেশন করে] যখন কোন বাড়ির মটকা (Top of the roof) ধরার জন্য কোন দণ্ড প্রথম দাঁড় করানো হয় তখন কোরীয়রাও আমাদের মত ভিত্ পুজো করে। সেই দণ্ডের দিকে পানীয় ও খাদ্য ছুড়ে দেওয়া হয়। পরিবারের অন্যান্য লোকেরা গান গায়: হে গৃহদণ্ডের (Ridg⋯pole) পিতামহ পিতামহী আমাদের সৌভাগ্য দাও, আশীর্বাদ কর। দীর্ঘজীবন দাও, বহু সন্তান-সন্ততি দান কর।

কোরীয়রা মনে করে যে, জীবন একটি অভিশাপের নিচেই রয়েছে। সেই অভিশাপই জাগতিক যে গুণসাম্য আছে মানুষের জীবনে তা নষ্ট করে দেয়। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দ্বারা এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে কোরীয়রা মনে করে, যেমন, সাধারণ একটি থানে একটি পাথর ছুড়ে দিয়ে যাত্রা করলে যাত্রাপথে পায়ে কোন আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে না। পুজোর বেদীতে থুথু ছিটোলে তা পবিত্র হয় বলে ধারণা, এবং অপদেবতা সেখানে আসতে পারে না [আমরাও অপদৃষ্টি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য গায়ে থুথু ছিটোই, মা ছেলেকে আশীর্বাদ করে মাথায় থুথু ছিটোন]। মৃতদেহকে সমাধি দেবার আগে মাটি-দেবতার পুজো করা হয়, তাকে খুশি করা হয়। একটি বিশেষ দেবতার নির্দেশ উপেক্ষা করলেই যে পাপ হয় তা নয়, জাগতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তবেই তা পাপ বলে বিবেচিত হয়। [আমাদের শাস্ত্রে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের মধ্যে রজঃ ও তম গুণ প্রবল হলে জাগতিক গুণসাম্য নষ্ট হয়, পাপ হয়, যার ফলে অবতার পুরুষ এসে গুণসাম্য রক্ষা করেন, তেমনই]।

জীবনে গুণসাম্য রক্ষা করার ভার মুডাং (Mudang) নামে এক শ্রেণীর গুণিনের উপর। এরা সাধারণত মহিলা হয়। এরা মানসিক ও দৈহিক রোগে ওঝার কাজ করে। প্রাচীন গ্রীসের মহিলা গণৎকার, মিনাড বা সাইবেরিয়ার শমনদের দায়িত্ব এই মহিলারাই পালন করে। সামাজিক বলিদান বা দেবতার নামে উৎসর্গীকরণ-অনুষ্ঠানও এদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কৃষকরা চাষের আগে এবং জেলেরা মাছ ধরার আগে এদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যায়। নিঃসন্তান মহিলারা এদের সাহায্যেই সন্তান পাবার আশা করে। মৃত্যুর পর মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে এরা এদের স্বর্গে যাবার পথ সুগম করে দেয়। দুর্ঘটনায়

মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এরা শান্ত করে থাকে। মুডাংরাই কোরীয়দের সমাজে কল্যাণকর বা কল্যাণকারিণী শক্তি।

সিনকিও ধর্মে জাগতিক গুণসাম্য নষ্ট করতে পারে এমন যে মৃত্যু-শক্তি তার প্রতি প্রবল এক ভীতি আছে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে কোরীয়রা মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য সব জিনিসপত্রসহ তাকে কবর দিত। [ভারতীয়রা অদ্যাবধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নানা জিনিস দান করে থাকে, যা পুরোহিতরা মৃত আত্মার নামে নিজেরা গ্রহণ করেন]।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে কোরিয়াতে কনফুসিয়স মতবাদের প্রভাব পড়লে তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিবেচিত হয় [পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতহি পরমন্তপ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা—ভারতীয় বিশ্বাস]। আমরা যেমন মৃত আত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় খাদ্য উৎসর্গ করি, ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে থাকি, পারলৌকিক ক্রিয়ায় কোরীয়রাও তাই করে থাকে। পারলৌকিক ক্রিয়া করলে পিতৃপুরুষেরা সন্তুষ্ট হয়ে কল্যাণ করবেন এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে আছে [যে-জন্যে আমরা প্রতি বছর এবং প্রতি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে থাকি।]

(ঙ) প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি হিসেবে হানানিম (Hananim) অথবা হানুনিম (Hanunim)-এর বিশেষ এক মর্যাদা রয়েছে কোরীয়দের কাছে। তিনিই সূর্যের আলো ও বৃষ্টি দান করেন। বজ্রপাত, অনাবৃষ্টি, ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় তিনিই পাঠান দুষ্ট মানুষকে শাস্তি দেবার জন্য। কোরীয়রা মনে করে যে, তাঁর অনুগ্রহেই মানুষ বেঁচে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে কোরিয়ার রাজা ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং জনগণের তরফে এই দেবতার কাছে তাঁদের পাপের স্বীকারোক্তি করতেন। এক অর্থে স্বর্গীয় পিতা রূপে হানানিম হলেন তানগুনের পিতামহ।

কোরিয়াতে কালক্রমে কনফুসিয়সবাদ, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর ফলে যে কোরীয়দের নিজস্ব ধর্ম সিনকিও মরে গেছে তা নয়, রূপ পরিবর্তন করে বরং শক্তিশালী হয়েছে। কনফুসিয়স থেকে এরা গ্রহণ করেছে নৈতিক আইন। তাওবাদ কোরীয় সিনকিওর জাদুকরী দিকের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, ও ধর্মের ক্ষেত্রে জিওম্যানসি (geomancy) বা ভারতীয় তন্ত্রের 'যন্ত্র' রূপের উদ্ভব ঘটিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা।

বৌদ্ধতত্ত্ব এখন এদের নিরাময় ও দীক্ষাদানের কাজ করে। কোরিয়ার নতুন ধর্মের পটভূমি হিসেবেও এই সিনকিও কাজ করেছে। খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং চোন্দোগাইও (Chondogyo) নামে যে নতুন ধর্মমত দেখা দিয়েছিল তার পেছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এই সিনকিও। নতুন ধর্মে জগতের সঙ্গে মানুষের পবিত্র সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৩) **ওসেনিয়ার (Oceania) আদিবাসী ধর্ম**: ওসেনিয়ার লোকেদের নানা ধরনের ধর্মবিশ্বাস আছে। স্তরে স্তরে নিচু থেকে উঁচু স্তরের দেবতা আছে। বন-ভূত আছে, বীর পূজা আছে, পূর্বপুরুষদের পূজা-পদ্ধতি রয়েছে, রয়েছে অভিজ্ঞান পূজা। কেউ কেউ বা সরাসরি অতীন্দ্রিয় শক্তিকে অনুভব করার চেষ্টা করেন, কেউ বা শুধুমাত্র অনুষ্ঠানেই বিশ্বাস করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মন্ত্র উচ্চারণ, নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। গ্রামের পুরোহিত, ওঝা, গণৎকার, প্রত্যাদেশ লাভ করা মানুষ, সব মিলিয়ে ওসেনিয়ার ধর্মসাধনা একটি জটিল সাধন ব্যাপার। জাদুকরেরাও অধ্যাত্মজগতের লোক হিসেবে বিবেচিত। তবে যারা জাদু করে, তুকতাক্ করে তারা সমাজবিরোধী বলেই বিবেচিত হয়। জাদুকরদের তুকতাক্-এর প্রতিবিধান করে গ্রামের পুরোহিতেরা।

ওসেনিয়াতে জাদু-ক্ষমতা ও ধর্ম খুব নিকট সম্পর্কে যুক্ত। তবে জাদু আর অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। এদের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। অনেক দ্বীপের অধিবাসী ইদানীংকালে তাদের পুরনো ধর্ম-ব্যবস্থা ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। তবে তুকতাক্ ও জাদুনীতি যে এখনও চলে গেছে তা নয়।

ওসেনিয়ার লোকেদের সৃষ্টি সম্পর্কে নানা ধারণা আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী চিরকালই ছিল। একে কেউ সৃষ্টি করেনি। আবার ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকে ভাবে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে। কোন এক দেবতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এরকম তত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করেন। এই স্রষ্টা দেবতাই তাদের কাছে শ্রেষ্ঠতম দেবতা বা দেবী। অনেকের মধ্য দিয়ে এই দেবতা বা দেবী সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে আড়ালে চলে গেছেন। ফলে গৃহদেবতা বা উদ্যানদেবতার মত তাঁর পুজো হয় না।

এক স্রষ্টা ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতির নানা পর্যায়ের নানা দেবদেবী আছেন, যেমন সমুদ্র-দেবতা, হাঙরের আকারে এই দেবতার পুজো হয়। সমুদ্রযাত্রা বা মৎস্য শিকারের আগেও এই দেবতার পুজো দেওয়া হয়। অতীন্দ্রিয় শক্তি দেবতার আকারেও থাকতে পারে, ভূতের আকারেও থাকতে পারে। ওসেনিয়ার লোকেদের

বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর যাদের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাযথভাবে করা হয় না বা যারা অতৃপ্ত অবস্থায় মারা যায় তাদের আত্মাই ভূত হয়ে থাকে। তবে এরা অর্থাৎ এই ভূতেরা মহৎ কার্য করে যে সব পূর্বপুরুষ গত হয়েছেন তাদের আত্মার মত নয়। এদের রীতিমত পুজো করা হয়। পুজো করা হয় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

ওসেনিয়ার লোকেদের মধ্যে সর্বত্রই যে অভিজ্ঞান পুজো আছে তা নয়, কোথাও কোথাও আছে। প্রকৃতির নানা জিনিসই অভিজ্ঞান হিসেবে কাজ করতে পারে, যেমন জন্তু-জানোয়ার, গাছগাছালি ইত্যাদি। ওসেনীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে, অতীন্দ্রিয় শক্তি ভাগ্য নির্ধারণ করে। সৌভাগ্যের জন্য নানা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

এদের অভিজ্ঞান পূজা নানা ছুৎবাই দ্বারা আচ্ছন্ন। নানা ধরনের প্রতীকী নৃত্য ও যন্ত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞান পুজো করা হয়। কোথাও কোথাও অভিজ্ঞান বিবাহের সঙ্গে যুক্ত, কোথাও বা যুদ্ধের সঙ্গে বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে। [ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা নৃসিংহ মূর্তিকে অবতার হিসেবে না দেখে দুটি অভিজ্ঞানধারী গোষ্ঠীর (মানব অভিজ্ঞান ও সিংহ অভিজ্ঞান) মধ্যে মিলনের প্রতীক হিসেবে দেখেন।]

ওসেনীয়রা বিশ্বাস করে যে, ভাল এবং মন্দ দুটি শক্তিই আছে। শক্তি একই তাকে ভালভাবে কাজে লাগানো হলে ভাল, মন্দ ভাবে কাজে লাগালে মন্দ। এ শক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার রুদ্ধ করাও যায়। এই শক্তিই হল জাদু ক্ষমতা ও অনুষ্ঠান ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতাকে আয়ত্ত করার জন্যই এত ঘটনা। এই শক্তিকে বলা হয় মানা (Mana)। অনুষ্ঠান দ্বারা একে জাগরিত করা যায়, আবার অকস্মাৎ কোন স্পর্শ দ্বারাও এ শক্তি জাগরিত হতে পারে। এই শক্তির অপব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেজন্য অর্থাৎ এই শক্তির অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা রকম বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করা হয়। যে-কোন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলেই লোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। সমাজে এর ফলে সাম্য ফিরে আসে বলে ওসেনীয়রা বিশ্বাস করে।

কৃষিকর্ম, ঋতু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বিজয়োৎসব, নবান্ন, মুণ্ড শিকার হেন কোন কাজ নেই যাতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান না করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবে ভারতবর্ষেও সর্বত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাধান্য রয়েছে। ওসেনীয়দের এ-ধরনের বিশ্বাস থেকে অদ্যাবধি ভারতীয়রাও মুক্ত নয়।

ওসেনীয় ধর্মাত্মারা এক স্থানে স্থির হয়ে নাও থাকতে পারেন। আমাদের ভারতীয় তীর্থস্থানের মত তাদেরও নির্দিষ্ট ধর্মস্থান আছে। অতীন্দ্রিয় নির্দেশ পাবার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। দেবতার উদ্দেশ্যে দান করার জন্যও বাঁধাধরা নিয়ম আছে। দেবতারা বা অতীন্দ্রিয় শক্তি নানা জিনিসের মাধ্যমে ওসেনীয়দের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন, যেমন পৌরাণিক কাহিনী, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ, নানা দ্রব্য ইত্যাদি। পবিত্র ধর্মস্থানগুলি হয় পাষাণ বেদী দিয়ে তৈরি, নয়তো পবিত্র কুঞ্জ বা মন্দির দিয়ে নির্দিষ্ট। নানা বাধানিষেধ দ্বারা এই পবিত্র স্থানগুলি সুরক্ষিত।

ওসেনীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাস নানা জাতির আগমনে নতুন নতুন চরিত্র লাভ করেছে। যেমন ফিজি (Fiji)-তে আছে সর্প পূজা, পূর্বপুরুষ পূজা ও অভিজ্ঞান পূজা। নতুন যারা এখানে এসে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তারাও এ অঞ্চলের প্রাচীন দেবদেবী বা ধর্মবিশ্বাসকে নানা ভাবে নিজেদের করে নিয়েছে—যেমন ভারতবর্ষে বহু জাতি এসে প্রবেশ করে ভারতীয় অধ্যাত্মতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, আবার তাদের নিজস্ব ভাবধারাও ভারতীয় ভাবনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

স্পষ্ট করে বোঝা না গেলেও অনুমান করতে বাধা নেই যে, সমুদ্রদ্বীপের এই মানুষেরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে মৃত্যুর পর পরলোক কি রকম তা নিয়ে এক এক গোষ্ঠীর এক এক ধরনের বিশ্বাস আছে। কোন কোন গোষ্ঠীতে সুযোগ্য পূর্বপুরুষেরা ঘোড়া হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁরা যে যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই সেই বিষয়ে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, যেমন যুদ্ধ, জাদুক্রিয়া, চাষবাস ইত্যাদি। কখনও কখনও পূর্বপুরুষদের সুদীর্ঘ বংশপঞ্জী কিংবদন্তীর কাহিনী হয়ে আছে [যেমন অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এক সময় লোকগাথারূপে প্রচলিত ছিল। এবং এর অনেক তথ্যই সুদীর্ঘ বংশপঞ্জীর ধারা বেয়ে এসেছে।] এদের ধারণা সাধারণত মৃত্যুর পর আত্মা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে [খ্রীষ্টানদের যেমন শেষ বিচারের জন্য কবরে অবস্থান করে।] আবার কারও কারও বিশ্বাস মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে কর্মফল অনুযায়ী নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কোন কোন স্থানে এক একটি গোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কবরখানা বা 'মৃতের স্থান' চিহ্নিত আছে। এ থেকে অনেকের অনুমান, এদের মধ্যে স্বর্গ সম্পর্কিত কল্পনা নেই। মৃত্যুর পর এই কবরখানাই তাদের নতুন জগৎ হিসেবে কাজ করে।

ওসেনিয়ার বিরাট অংশ এখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। টোঙ্গা, মাওরিল্যাণ্ড ও ফিজি (Tonga, Maoriland and Fiji)-র প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এখন আর নেই বললেই চলে। তবে এখনও ওসেনিয়ার কেন্দ্রস্থলেই জড়বস্তুতে শক্তি পুজা, জাদুক্ষমতা ও তুক্‌তাকে বিশ্বাস টিকে আছে। বড় বড় দ্বীপগুলির গভীর পার্বত্য অঞ্চলে এখনও প্রাচীন স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসগুলি রয়ে গেছে। পশ্চিম মেলানেশিয়াতে এখনও মৎস্য শিকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, কৃষি অনুষ্ঠান, বিনিময় প্রথা প্রভৃতি টিকে আছে। পাপুয়া, নিউগিনি ও পশ্চিম ইরিয়ানেও এসব বিশ্বাস রয়ে গেছে। এখানকার শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত তুক্‌তাক ও মন্ত্রতন্ত্রকে ভয় করে। তুক্‌তাকের প্রতিকার যারা জানে এখানকার শহর-জীবনে অদ্যাবধি তাদের বেশ সম্মান। তবে ঔপনিবেশিক সরকার নরমাংস ভক্ষণ, মুণ্ড শিকার এবং আরও অন্যান্য নিষ্ঠুর ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে এদের ধর্মবিশ্বাসের আদিম চরিত্রের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তার মধ্যে এদের অনেক প্রাচীন বিশ্বাস সূক্ষ্মভাবে স্থান করে আছে।

(৪) **মেলানেশিয়ার ধর্ম**: মেলানেশিয়া হল প্রশান্ত মহাসাগরে। নিউ-গিনির পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বে ফিজি, উত্তরে পাপুয়া থেকে দক্ষিণে নিউ ক্যালেডোনিয়া (New Caledonia) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে ইরিয়ান, জয়, পাপুয়া, নিউগিনি, টোররেস, স্ট্রেইট আইল্যাণ্ড, সোলোমন আইল্যাণ্ড, নিউ ক্যালেডোনিয়া (Irian, Jaya, Papua, New Guinea, Torres, Strait Islands, Solomon Islands, New Caledonia) প্রভৃতি। এখানকার পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে কম করেও ১২০০ বিভিন্ন ভাষা চালু আছে। শতাব্দী কালের উপর ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার পর এখানকার প্রাচীন ধর্মে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তবে সমস্ত কিছুর অন্তরালে এখনও সেই প্রাচীন বিশ্বাসের অনেক কিছুই প্রবহমান।

অধ্যাত্ম জীবন ও পার্থিব জীবন, এর মধ্যে মেলানেশীয়রা তেমন একটা পার্থক্য করে না। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যেও তাদের কাছে ভেদাভেদ কম। বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে এদের বিশেষ এক চিন্তা আছে। এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তাদের অধ্যাত্ম জীবনের একটা বড় দিক। মানুষ, দেবদেবী, ভূতপেত্নী, অভিজ্ঞান, জাদু ক্ষমতা, জল মাটি, জীবজন্তু, গাছগাছালি সর্বত্রই এক শক্তি বিদ্যমান মেলানেশীয়রা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে [এ তত্ত্ব ভুল নয়। ভারতবর্ষও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে। বর্তমান বিজ্ঞানও করে। তবে এই শক্তি কোথাও সুপ্ত, কোথাও বা ক্রিয়াশীল।]

পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কে এরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মনে করে যে, মহাজীবনের কেন্দ্রে মানুষ ও সূক্ষ্মাত্মা সবাই প্রাণশক্তিতে শক্তিমান। কোন নির্দিষ্ট বৃহৎ পরিবার, সমাজ ও স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি সেই পরিবার, স্থান ও সমাজের নিরাপত্তা লাভ করে। অর্থাৎ এখানকার সকলেই সকলের সঙ্গে একাত্মভাবে বাস করে, সুখ দুঃখে সমভাগী হয়। জাতকর্ম থেকে বিবাহানুষ্ঠান, বয়সকালে ধর্মে দীক্ষা, পারলৌকিক ক্রিয়া সব কিছুতেই গোষ্ঠি সমাজের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হয়। তবে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবোধ, পারস্পরিক সন্দেহ ও শত্রুতা প্রায়শই নিষ্ঠুর সংঘাতে পরিণতি লাভ করে।

মেলানেশীয়দের প্রাচীন ধর্মে অভিবাসনের গল্প, কিংবদন্তী, নানা পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি স্থান লাভ করে আছে। এছাড়া আছে ধর্মসংগীত, প্রার্থনা, মন্ত্র ইত্যাদি। এ-ধর্মের সামান্য অংশ জানে দীক্ষিত পুরুষেরা। কিছুটা জানে বিশেষ কিছু ধর্মীয় ব্যক্তি ও বয়স্ক মহিলারা। গুহ্য তত্ত্ব শুধুমাত্র বয়স্ক দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

সৃষ্টি নিয়ে মেলানেশীয়দের মধ্যে নানা ধরনের গল্প আছে। তবে কিভাবে বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়েছে, তা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। অনেকে মনে করে যে, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন দেবতাদের দান।

সব মেলানেশীয়রাই যে জগৎস্রষ্টা 'এক দেবতাতে' বিশ্বাস করে তা নয়। দেবদেবীরা মানুষ নিয়ে মাথা ঘামায় এমন বিশ্বাসও অনেকের নেই। তবে অনেকেই আবার বিশ্বাস করে যে, দেবতারা জগৎ সৃষ্টি করে তার পালনের জন্যও যত্নশীল হয়েছেন। অনেকে নানা ধরনের সূক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাস করে, এমনকি ভূত-পেত্নীতে। দৈত্য-দানো, ডাইনী প্রভৃতি মানুষের ক্ষতি করতে পারে এ ভয় তাদের আছে।

সকলেই পূর্বপুরুষের পুজো করে। কেউ কেউ বা মনে করে যে, মৃত পূব-পুরুষদের আত্মারা ফিরে আসবেন। এতে তারা আনন্দবোধ করে। মৃত আত্মার প্রত্যাবর্তনের চিন্তাতে অনেকেই আবার ভীতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। অনেকে মনে করে যে, পূর্বপুরুষের আত্মা অধস্তন পুরুষদের কল্যাণ কামনা করে। এরা ভাবে যে, মৃত আত্মার উদ্দেশে উপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ও শোকপ্রকাশ করা হলে এবং পিণ্ডদান, শূকর উৎসর্গ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস দেওয়া হলে তাঁরা প্রীত হন এবং অধস্তন পুরুষদের রক্ষা করে চলেন। যারা অভিজ্ঞান পূজা করে তারা জন্তু-

জানোয়ার, বৃক্ষলতা, পাখি, মাছ ইত্যাদির মধ্যেও পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব অনুমান করে। এগুলিকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে পুজোও করা হয়।

নানা অনুষ্ঠান আছে এদের মধ্যে। এইসব অনুষ্ঠান নিত্য কর্ম, যেমন শিকার, চাষবাস, মাছ ধরা ইত্যাদির সঙ্গে এবং বড় বড় পার্বণ যেমন নববর্ষ, নতুন মাস, নতুন সপ্তাহ ইত্যাদির সঙ্গেও যুক্ত।

বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মহিলা ও তরুণ-তরুণীরা গৌণ ভূমিকা নেয়। এই সব অনুষ্ঠানে শূয়র বিশেষ মূল্যবান। বড বড় অনুষ্ঠানের সময় উপবাস, ব্রহ্মচয পালন ইত্যাদিও চলে [ঠিক আমাদের বড় বড় পার্বণে আমরা যেমন করে থাকি]। অনেকে মনে করে যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান দ্বারা দেবদেবীদের কাজ করানো যায় [যজ্ঞ দ্বারা আর্যরা যেমন, দেবদেবীদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন, তেমনই]। আবার অনেকেরই ধারণা গ্রীকদের মত, অর্থাৎ দেবতারা নিজেদের মেজাজ মর্জি অনুসারে কাজ করেন।

মেলানেশীয় সমাজে প্রত্যেকেই প্রায় জাদুক্ষমতায় বিশ্বাস করে। ফলে গুণিনরা মেলানেশীয় সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এরা মানুষের মৃত্যু ঘটান বলে ধারণা, কারণ মেলানেশীয়রা বিশ্বাস করে যে, কেউ মৃত্যু না ঘটালে মৃত্যু হতে পারে না। প্রত্যেক মেলানেশীয় সমাজেই অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু লোক আছে। এদের মধ্যে কেউবা সে দায়িত্ব পায় সাময়িক ভাবে, কেউ স্থায়িভাবে, কেউবা বংশগত ভাবে।

প্রাকৃতিক কোন গুহা, জলাশয়, নদী, পাহাড়পর্বত ইত্যাদি মেলানেশীয়দের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন আমাদের কাছে নানা নদীসঙ্গম (প্রয়াগসঙ্গম, সাগরসঙ্গম, গঙ্গাসাগর মেলা) হিমালয় প্রভৃতি পবিত্র স্থান হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া মনুষ্য নির্মিত বহু মন্দির তো আছেই।

মেলানেশীয়দের কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, আবার কারো কারো বিশ্বাস দেবতারা মানুষের নৈতিক কাজকর্ম দেখেই সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণ পাপুয়ার পার্বত্য হুলিদের (Huli people) দেবতা দাতাগালিওয়াবে (Datagaliwabe) মানুষের নৈতিক উন্নতি দেখেই বেশি প্রীত হন।

মেলানেশীয়দের মধ্যে গল্প আছে যে, এদের মধ্যে কেউ (পুরোহিতশ্রেণীর নিশ্চয়ই) স্বপ্নে অথবা গভীর মনোসংযোগের সময় দেখতে পেয়েছিলেন যে, এক জন মুক্তিদাতা (অবতার) পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে মেলানেশিয়াতে ফিরে আসবেন।

আকাশ-পথেও তিনি আসতে পারেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসবেন প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী। তাঁদের আবির্ভাব মেলানেশিয়াতে নবযুগের সূচনা করবে। মেলানেশীয়রা সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের মধ্যে সাম্য আসবে। [এধরনের স্বপ্ন বা দর্শন পার্থিব বিচার বুদ্ধির কাছে হাস্যাস্পদ ঠেকলেও এ যে অর্থহীন তা নয়। এধরনের দর্শনের অর্থ একমাত্র ভারতীয় যোগীরাই করতে পারেন। কারণ, তাঁরা পরমাত্মায় নানা ঘটনার বিচিত্র দৃশ্য, নানা বিচিত্র নরনারী, যানবাহন ইত্যাদি দেখতে পান। ভারতীয় যোগীরা দশ অবতারের শেষ অবতার কল্কি সম্পর্কেও সেই যোগদর্শনের মাধ্যমেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অনেকের ধারণা, হিমালয় থেকে তিনি সমতলভূমিতে অবতরণ করবেন। উত্তর-পূর্ব গিরিপথ বেয়ে তিনি ভারতমৃত্তিকাতে নেমে এসেছেন এ ধরনের দৃশ্যও অনেক যোগী দেখতে পেয়েছেন। মেলানেশীয়দের মুক্তিদাতা সম্পর্কিত কল্পনা সেই মনঃসংযোগজাত দর্শনের ফলে যে হয়নি একথাই বা কে বলতে পারে?] এই নতুন চিন্তাধারা বা অবতার আগমনের চিন্তার ফলে অনেক সময় এদের মধ্যে প্রবল আলোড়নও দেখা দিয়েছে। নতুন জীবনের জন্য নানা জনে নানা দান করছে, শূয়র বলি দিচ্ছে। কবরগুলির প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে যাতে পূর্বপুরুষেরা অবাধে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

এই নতুন বিশ্বাস থেকে মেলানেশীয়দের ধর্ম সম্পর্কে যে-সব জিনিস বর্তমানে জানা যায় তা হল :

(ক) এখনো এদের ধর্মে আদিম ধর্মচিন্তা রয়ে গেছে।

(খ) খ্রীষ্টধর্মের কিছু প্রভাবও এদের উপর পড়েছে।

(গ) পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রত্যাবর্তনে এদের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

(ঘ) অবতার সম্পর্কেও এদের বিশ্বাস আছে।

(ঙ) মেলানেশীয়রা এক সময় শ্বেতকায় ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

(চ) ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ-এর চেষ্টা চলেছে।

(ছ) এ সব ধর্মান্দোলন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করছে।

মেলানেশীয়দের পৌরাণিক কাহিনীতে যে পাঁচটি মুখ্য লক্ষণ দেখা যায় তা হল :

(ক) আদি মানুষ দুই ভাই পৃথক হয়ে যাবার ফলে মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ দেখা দিয়েছে।

(খ) এই দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন ছিল বোকা এবং আর এক ভাইয়ের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। পরে অবশ্য তাদের আবার মিলন হবে, ফলে মানবসমাজও একত্রে মিলিত হবে।

(গ) মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছে নিজেদের বোকামি, অকৃতজ্ঞতা ও দুর্বিনীত ভাবের জন্য।

(ঘ) বর্তমান পৃথিবী বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ঙ) অবতার পুরুষ মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে পৃথিবীতে আবার নতুন যুগের সূচনা করবেন।

(৫) **নিউগিনির ধর্মবোধ : পাপুয়ার ফো (Foe)-দের ধর্মবিশ্বাস** : পাপুয়ার দক্ষিণ পার্বত্য অঞ্চলে 'ফো' নামে এক মানবগোষ্ঠী বাস করে। তাদের মতে মুখ্য শক্তি বাস করে প্রাচ্যে (Ama'a Hai Tao)। তিনি মুখ্য শক্তি হলেও বিশ্বস্রষ্টা নন। এই মুখ্য শক্তি বা দেবতা বাদেও তিনশ্রেণীর দেবতা আছেন, এরা প্রকৃতির নির্দিষ্টস্থানে বা অঞ্চলে বাস করেন। দেবতাদের বা শক্তির এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে আছে :

(ক) খারাপ শক্তি (ma'me gai)।

(খ) হিসারে (Hisare)

(গ) হিবুজী (Hibu jii)

এই তিনশ্রেণীর দেবতার সঙ্গে গ্রামের মানুষ বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। যারা এই সম্পর্ক স্থাপন করে অপরে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে, যাতে তাদের নিজেদের কল্যাণ হয়।

পাপুয়ার 'ফো'-রা বিশ্বাস করে যে, এক দঙ্গল জড়াজড়ি করা গাছে, বড় পাহাড়ে বা অস্বাভাবিক কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যে অশুভশক্তি থাকে। এদের অন্ধবিশ্বাসের একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালেও। গেছে (Gese) গ্রামের জলাভূমির বাঁশ বনে ইগরে (Igare) নামে এক ব্যক্তি ছোট একটি জায়গায় লাল গুল্মের ঝোপ গজিয়ে উঠতে দেখেন। বেশ যেন গোছানো। স্থানটি কুতুবু হ্রদের (Lake Kutubu) দক্ষিণ-পূর্বদিকে। স্থানীয় সকলেরই বিশ্বাস জন্মে যে, কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি সেখানে ঘর বেঁধেছে। এ-সব জায়গা সাধারণ ভূতপ্রেতের জায়গা, ফলে লোকেদের বিশ্বাস জন্মে যে ঝোপটি অশুভ শক্তির আস্তানা। [এরকম বিশ্বাস আমাদের দেশেও আছে, তা ছাড়া প্রেতাত্মা বলে জিনিসও আছে। যে সূক্ষ্ম তরঙ্গের সূক্ষ্ম বস্তু দিয়ে সেই দেহ গঠিত, মানুষের চেতনাকে সেই সূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে যেতে পারলে এই সব

সূক্ষ্ম জীবাত্মা বা প্রেতাত্মাকে দেখা যায়। মানুষের দেহের উপর যে পাঁচটি স্তর আছে তার তিনটি স্তর (যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত আত্মা যদি কর্মফলের ভারে অবস্থান করে তবে তারাই প্রেতাত্মা নামে অভিহিত হয়। এবং তিনটি স্তরই যথার্থ নরকের স্তর। যোগীরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই স্তরের সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মাদের দেখতে পান] পাপুয়ার লোকেদের বিশ্বাস যে, যারা এই প্রেতাত্মা বা অশুভ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে তারা এদের সাহায্য পায়, কোন ক্ষতি করে না, [আমাদের দেশে এদেরই পিশাচসিদ্ধ বলে। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রার আগে একজন পিশাচসিদ্ধের কাছে ভবিষ্যৎ জানতে গিয়েছিলেন] কিন্তু যারা এদের বিরক্ত করে তাদের হাত পা ফুলে যায়, পেটও স্ফীতকায় হয়। বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েদের এ-সব অশুভ শক্তির আস্তানার ধারে কাছে যেতে দেন না, কারণ, ভুলক্রমে এরা বিরক্ত হলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। যাদের বাসগৃহ এই অশুভ শক্তির আস্তানার কাছাকাছি তারা ছেলেমেয়েদের সেখানে গোলমাল পর্যন্ত করতে দেন না।

লেকের আরও উপরের দিকে হিসারে নামে অশুভ শক্তি বাস করে বলে 'ফো'-রা বিশ্বাস করে। লেকের জলেও গুরুকা (Guruka) নামে প্রেতাত্মারা থাকে বলে অনেকের বিশ্বাস [আমাদের দেশে জলার ধারে মেছোভূতের মত]। হিসারে সিদ্ধ গুণিনরা হিসারের সঙ্গে নৃত্য করতে আরম্ভ করলে জল থেকে উঠে এসে গুরুকারাও এর সঙ্গে যোগ দেয়। এরা একধরনের পাখির পালক বা মানুষের হাড় এনে গুণিনদেব দান করে যাতে এ-সব তারা হিসারে সাধনায় কাজে লাগাতে পারে। দান অনুসারে পরের মাসেই যে পাখির পালক এরা দেয় সেই পাখিই ধরা পড়ে, অপর পক্ষে হাড় দেওয়া হলে একজন মানুষ মারা যায়।

আরও অনেক জীবাত্মা বা অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সোরো (Soro) নামে একধরনের বায়ুভূত আছে যারা নাকি হাওয়ায় ভেসে ভেসে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। এরা সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে। [আমাদের দেশে একেই বলে হাওয়া লাগা]। এই ভূতকে ছেলেপেলেরাই বেশি ভয় পায়। এদের ভয় হাওয়া-ভূত এদের ধরে তুলে নিয়ে যাবে, বা কোন ভয়ানক ক্ষতি করবে। তবে বয়স্করা মনে করে যে, এদের সঙ্গেই কাজ করতে হবে [আমাদের দেশে আমরা যেমন সাপ নিয়ে ঘর করি—'আমরা হেলায় নাগেরে দোলাই নাগেরই মাথায় নাচি'—সত্যেন দত্ত] ভূত বা অশুভ শক্তি জীবিত মানুষের মধ্যেই বাস করে এরকম বিশ্বাসও

এদের আছে। যে-শক্তি মানুষের মধ্যে বাস করে তাদের এরা বলে বইসেসে (baisese)। এদের একজোড়া বা তারও বেশি শক্তি নিদেন পক্ষে একটি হাওয়া-ভূতের সঙ্গে কাজ করে। কোন মানুষের যদি কোন শত্রু থাকে, তবে তার ভেতরকার শক্তিকে এবং তার সহযোগী হাওয়া-ভূতকে খুঁজে বের করে তার ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে। ১৯৬০ সালে নাকি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল যে, নিদ্রিত মানুষের কাছে একটি ঢিল এসে পড়ে। তখন সে বুঝতে পারে যে, তার ভেতরকার শক্তি বেরিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামের আর এক ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করছে। লোকটি বুঝতে পারে যে, হেগেসো (Hegeso) গ্রামের একটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বস্তুত দুদিন পরে ঐ গ্রামের একটি লোক মারা যায়। [এরকম ঘটনা অমাদের দেশেও ঘটে। এই জন্য অনেকে শনি ও মঙ্গলবারকে বড় সমীহ করে চলে। এই দিন দুটি তুকতাকের পক্ষে প্রকৃষ্ট। বর্তমানে লেখক নিজে ৪৪নং বিশালাক্ষীতলা রোড, কলিকাতা—৩৪, বুলন নামে একটি ছেলেকে এইভাবে তুকতাকের ফলে একদিনেই মরে যেতে দেখেছেন]

অশুভ শক্তির মধ্যে 'কো'-রা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকেই সব চাইতে বেশি ভয় করে। অপঘাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাই অশুভ প্রেতাত্মাতে রূপান্তরিত হয়। [এ-বিশ্বাস আমাদের দেশে অদ্যাবধি আছে।] এইসব অশুভ প্রেতাত্মা ছোট পাথরের ঢিল বা অন্য কোন ভাবে মানুষের দেহে ঢুকে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটায়। অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে 'কো'-রা বলে বানওয়াবে (banwabe)। এই ভূতেরা উপরে বাস করে এবং লাল রঙ গায়ে মেখে থাকে। যারা এই ভূতের পুজো করেন তাঁরা স্বপ্নে বা অন্যভাবে তার দেখা পান। এরা সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে অপঘাতে মৃত ব্যক্তির শত্রুদের এই প্রেতাত্মা অসুবিধা সৃষ্টি করে।

অপঘাতে মরা ছাড়া অন্যভাবে যারা মারা যায় তাদের জীবাত্মা প্রথম যায় পূর্ব দিকে, তারপর ফিরে এসে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অল্প সময়ের জন্য হলেও এ কাজ তারা করেই। এরা মানুষকে অসুস্থ করলেও তাদের কোন ক্ষতি করে না, মৃত্যুর কারণ হয় না। ছেলেরা খুব কান্নাকাটি শুরু করলে মা তাদের তাই ভয় দেখান—যদি না থাম, প্রেতাত্মা বাঁশ ও পাতা নিয়ে আসবে, সেই পাতায় চোখের জল ধরে নিয়ে গিয়ে পান করবে। চোখের জল যদি মিষ্টি হয় তা হলে ক্ষতি করবে। [যেন আমাদের দেশের 'ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এলর' মত।]

এক সময় বিশ্বাস ছিল যে, গুণিন, ওঝা বা বদ্যিরা এই সব অপদেবতা প্রোথিত দণ্ড বা নিক্ষিপ্ত পাথর-এর শক্তি শুষে নিতে পারত। তাদের কড়ির মালা বা শূয়র পুরস্কার দেওয়া হত। আজ আর এ-প্রথা টিকে নেই। এ-প্রথা মরে যাবার কারণ, গুণিনরা দাবি করত অনেক, তা ছাড়া এরা যে সবাইকে ভাল করতে পারত তা নয়। বর্তমানে অনেক অসুখবিসুখের আধুনিক মতে চিকিৎসা হচ্ছে। আসলে যে-কোন রোগকেই আগে এরা অপদেবতার কীর্তি বলে ভাবত।

এ-সব অঞ্চলে তুক্‌তাককারীর প্রতি বড় ভয় আছে। জাদুকর বা গুণিনদের ছোট এক টুকরো বাঁশ অসাধ্য সাধন করতে পারে 'ফো'-দের এই বিশ্বাস ছিল। 'ফো'-এর গুণিনরা তিন ভাবে জাদু করত, যেমন—

(ক) দণ্ড দিয়ে ত্বক স্পর্শ করা। এই জাদুদণ্ডের ছোঁয়া লাগলে মানুষের একদিন বা দুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় এই বিশ্বাস ছিল। বাঁশের মধ্যে সাদা গুঁড়োর মত যে জিনিস আছে তা দেহের ত্বকে লাগলেই ক্ষতি হয় বলে ধারণা ছিল। পানীয় জলে বা খাবারের মধ্যে এ সব মিশলেও ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস ছিল।

(খ) দ্বিতীয়ত মানুষের কোন জিনিস যদি, (যেমন কাপড়ের টুকরো) এই জাদুদণ্ডে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় এবং তা যদি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় [আমাদের দেশে মহিলাদের কাপড়ের আঁচল কেটে নেবার মত] তবে তা ছিল প্রচণ্ড ক্ষতিকর। তাছাড়া পিঁপড়ের ঢিবিতে তা রাখলে বা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেও ক্ষতির কারণ হয়। এ-সব ক্ষেত্রে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু হয়।

(গ) ছোট ছোট সাদা পাথরের টুকরো দিয়েও একরকমের তুক্‌তাক চলে। গুণিনরা গাছের আঠা এই পাথরে ঘষতে ঘষতে মন্ত্র পড়ে। এর ফলেও যার উদ্দেশ্যে এই তুক্‌তাক্ করা হয় তার মৃত্যু হয়।

[এ-সব নিঃসন্দেহে সংস্কার। তবে এর মধ্যে যে অদ্ভুত একটা ব্যাখ্যাতীত রহস্য কাজ করত, তাতে সন্দেহ নেই। আজও এ-সব তুক্‌তাক্ আমাদের দেশেও অনেক দেখা যায় এবং তাতে ক্ষতিও হয়, তা ছাড়া মানুষের দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম কোন শক্তি বাস করে—এ ধরনের যে বিশ্বাস 'ফো'-দের আছে তাও একেবারে ভুল নয়। কারণ ভারতীয় যোগীরা সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করে এ-সব দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করতে পারেন এমন এক যোগীকে আমি দেখেছি—তিনি হাওড়া বাকসাড়ার সরোজকুমার লাহিড়ী। এ ছাড়া টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে প্রতাপাদিত্য রোডের মুখে স্বরাঙ্কনার বিনয় গাঙ্গুলীও এক সময় সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করতে পারবেন বলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছেন। ফলে এসব বিশ্বাস

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এ জন্যই বোধহয় ফরাসী বৈজ্ঞানিক Pascal বলেছিলেন 'The heart has its reason of which reason knows nothing'. মানুষের দেহ মন ও আত্মা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। —যোগতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।]

(৬) **অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস**: প্রথমে যখন ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সংস্পর্শে আসে, তারা ভেবেছিল যে, এদের কোন অধ্যাত্মতা নেই। ইউরোপীয়রা যখন অস্ট্রেলিয়াতে আসে তখন সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসী ছিল। তবে এরা কমপক্ষে ২৭-টি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এদের সকলের নানা পুরাণ কাহিনী মিলে-মিশে গিয়ে আদিবাসীয় কতকগুলি বিশেষ বিশ্বাসও জন্ম নিয়েছিল। ফলে জগৎ সম্পর্কে এদের সকলেরই প্রায় একই রকম ধারণা ছিল। তবে এদের অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস এক এক গোষ্ঠীর একএক ধরনের ছিল। এরা কেউই সর্বোত্তম কোন দেবতাতে বিশ্বাস করত না। তবে উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গুহাচিত্রে বন্দজিনা (Wandjina) নামে এক অতীন্দ্রিয় শক্তির চিত্র পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূব অস্ট্রেলিয়ার নানা গল্পেও এর উল্লেখ আছে। এর মত অন্য কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি এতটা মর্যাদা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছ থেকে পায়নি। ফলে মনে হয় বন্দজিনার যথেষ্টই মর্যাদা ছিল। গ্রীকদের জিউস বা রোমানদের জুপিটার-এর মত তিনি হতে পারেন।

পশ্চিম ও মধ্য অস্ট্রেলিয়াতে দীক্ষাকাল আদিবাসীদের ছুন্নত হত। পূর্ব অস্ট্রেলিয়াতে অবশ্য এ-রীতি অনুসরণ করা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মৃত্যুর পর পরলোক নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। বরং অতীতের দিনগুলি নিয়ে বেশি চিন্তা করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, অতীত ছিল স্বপ্নের সময়। তখনই পৃথিবী আধুনিক পৃথিবীর আকৃতি নেয়। প্রাণিজগতে মানুষের আদি নমুনা হিসেবে ছিল ক্যাঙ্গারু (Kangaroo)-মানুষ, এমু (Emu)-মানুষ ও নিকুঞ্জপাখি মহিলা (Bowerbird women), ডুমুর মানুষ (Figmen) প্রভৃতি। [এর অন্তরালে হয় তো বিবর্তনবাদের একটা সূক্ষ্ম ধারা রয়েছে, যেমন আছে ভারতীয় দশাবতারে। কিংবা এখানে এক ধরনের অভিজ্ঞানতত্ত্ব (Totemism) কাজ করেছে]। এই সব পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহসাদি, হাসি কান্না, নাচগান সবই করত। তাদের নর্তনকুর্দনেই পাহাড়, পর্বত, গাছ-গাছালি, গুহা, গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছিল। [যদিও এ-সব অদ্ভুত সব

জিনিস ধ্যানমার্গে ঊর্ধ্ব জগতে বহু দেখা যায়, তবুও মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, অস্ট্রেলিয়রা তাদের প্রাকৃতিক জীবজন্তু দেখেই এ ধরনের অদ্ভুত ভাবনার জন্ম দিয়েছিল।] আদিবাসীদের এই সব পৌরাণিক গল্পের জন্য এ-সব প্রাণী তাদের পূজার পাত্র হয়েছে। এবং পাহাড় পর্বত নদনদী হ্রদ ইত্যাদি তাদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এইসব তীর্থক্ষেত্র বা প্রাকৃতিক পবিত্র পটভূমির মধ্যে অনেকগুলি শুধুমাত্র পুরুষদের এবং অনেকগুলি মহিলাদের ও শিশুদের ধর্মকর্মের জন্য নির্দিষ্ট। স্বপ্নজগতের এই প্রাণীদের কার্যপ্রণালীই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। স্বাপ্নিক এই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যেই আদিবাসীদের নৈতিকতা লুকিয়ে আছে। এই স্বপ্নজগৎ সম্পর্কে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময়ই একই ধরনের শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ দেখে মনে হয় যে, একসময় অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসীরা ছিল যাযাবর। দেশের নানা স্থানে এই সব তীর্থস্থানগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের লোকগাথার মধ্যেই অস্ট্রেলীয়দের যাযাবর বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এক অদ্ভুত সুরে লোকগীতিগুলি গীত হয়। লোকগীতির কাহিনীগুলিই পৌরাণিক কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে কোন যাজক বা পুরোহিত নেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রত্যেককেই সক্রিয় অংশ নিতে হয়। তবে যে-সব প্রধান ব্যক্তি অতীতের এই সব লোকগাথা ও পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বেশি মনে রাখতে পারেন তারাই বেশি সম্মানিত। [ব্রাহ্মণরা বেদের স্তোত্রকে মনে রাখতে পারত বলেই সমাজে বেশী সম্মানীয় ছিল] যে সব পাথরে পৌরাণিক গল্প কাহিনীর প্রতীকী চিহ্ন ছিল সেই সব পাথরকে এরা অর্থাৎ প্রবীণেরা সযত্নে রক্ষা করত। এইসব প্রবাদপুরুষদের শক্তি গুহা-গহ্বরে লুকিয়ে আছে এরকম বিশ্বাস রয়েছে। প্রবীণেরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদের আহ্বান করে বাইরে নিয়ে আসে। নানা গুহাতে যে-সব প্রতীকী চিত্র আছে তার মধ্যে আদিবাসীদের এই বিশ্বাস-এর ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। এইসব পবিত্র স্থানগুলি রীতিমত শ্রদ্ধালাভ করে থাকে। স্থানগুলো পুরুষেরাই কেবল দর্শন করতে পারে, মহিলারা নয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা স্বপ্নজগতের স্মৃতিচারণার জন্য এক ধরনের নৈশকালীন অনুষ্ঠান করে [আমাদের শক্তিপূজাও (৺কালীপূজা) রাত্রিবেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে]। সাধারণত এ-সময় বিশেষ এক ধরনের নৃত্য হয়। পৌরাণিক লোকগাথাগুলি এই সময় গীত হয়। এই নৈশ অনুষ্ঠানের জন্য এক ধরনের বিশেষ রঙে দেহ রঞ্জিত করা হয় [আমাদের দেশে বৈষ্ণবেরাও এক ধরনের তিলকে দেহ

সজ্জিত করেন]। এই নৈশক্রিয়ার •কোনটা দলের সবাই দেখতে পায়। কোন কোন অনুষ্ঠানের শুধু পুরুষরাই অধিকারী। মেয়েদেরও বিশেষ রকমের অনুষ্ঠান আছে যেগুলি উর্বরাশক্তির সঙ্গে যুক্ত। বিবাহিতা রমণী ও জননীরাই এগুলি করে থাকেন। কতকগুলো অনুষ্ঠান জীবনে নতুন দিকের সূচনা করে, যেমন ছুন্নত [আমাদের দেশে উপনয়ন]। এই ছুন্নত হবার পরই মানুষের অধ্যাত্ম সাধনার কিছু গুহ্যতত্ত্ব তাদের কাছে তুলে ধরা হয় [উপনয়ন যেমন গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের সূচনা করে]। এই ছুন্নতের সময়ই অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা পৌরাণিক কাহিনী ও প্রাচীন লোকগাথার সঙ্গে পরিচিত হয়। যারা এই দীক্ষা লাভ করে তারাও তখন পবিত্র বলে চিহ্নিত হন। কোন আদিবাসী যুবক যদি আরেক গোষ্ঠীর যুবককে আঘাত করে তবে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজের গোষ্ঠীর কোন মেয়েকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়।

এই আদিবাসীরা মূলত যাযাবর। শিকার করে বেড়ায় ও ফল সংগ্রহ করে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য বা পাবার জন্য এরা বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান করে। নানাভাবে এই অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া করা হয়, যেমন, পাহাড়ের গায়ে বা বড় পাথরের গায়ে আর একটি পাথর ঘষে, বা গিরিমাটি ঘষে, বিশেষ একটি স্থান পরিষ্কার করে বা নিজের দেহ থেকে পবিত্র পাথরের উপর রক্ত ঢেলে, বিশেষ বিশেষ গান গেয়ে ও নৃত্য করে।

গিরিমাটি ঘষে অনুষ্ঠানগুলি অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম ও মধ্য মরু অঞ্চলে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাহাড় পর্বত যুক্ত হয়ে এর ভিন্ন রকম একটা ইঙ্গিত তৈরি করেছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী অস্ট্রেলীয়রা বিশ্বাস করে যে, পাহাড়ের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের শক্তি লুকিয়ে আছে। এই শক্তিকে কোন রকমেই কেউ উত্তেজিত করতে চায় না। যথাযথ অনুষ্ঠান করলে এই শক্তি মানুষের কল্যাণে আসে বলে ধারণা। অনবরত এই অনুষ্ঠান করলে নির্দিষ্ট স্থানগুলির অলৌকিক ক্ষমতা আরো বাড়ে বলেও এরা বিশ্বাস করে। ফলে মানুষও শক্তিশালী হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, স্থায়ী জিনিস হল অধ্যাত্ম শক্তি। তাদের ধারণা, মানুষের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি তাদের অভিজ্ঞান (Totem) ও পার্থিব জগতের অন্যত্র সর্বত্রই রয়েছে—জড় অজড় সর্বত্র। [ভারতীয় তন্ত্রের মতে একথা অত্যন্ত সত্য। শক্তি মানুষের জীবনে মূলাধারে সুপ্ত থাকে। শ্বাসে প্রশ্বাসে তার মাত্র দশভাগ কাজ করে।

এই দশভাগের উপরে সুপ্ত শক্তি কাজ করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই একজন মানুষ অতীন্দ্রিয় শক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এই শক্তি জড় পদার্থেও থাকে। এবং এর চৌম্বক আকর্ষণই পদার্থের অণুগুলিকে একটি কেন্দ্রে ধরে থাকে। বিস্ফোরণে সেই ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠলে (পারমাণবিক বিস্ফোরণ) সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে। সুতরাং আদিবাসীদের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, সে কথা বলা চলে না।] মৃত্যু হলে বা স্থূলবস্তু ধ্বংস হলে এই শক্তি মূল শক্তিতে মিশে যায়। [ভারতীয়দের লোকায়তদার্শনিকেদের অনেকেই যেমন মনে করেন যে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুর সমন্বয়েই মানবদেহ বা জীবদেহ। মৃত্যু হলে এইসব দৈহিক উপাদানগুলি মূল উপাদানে ফিরে যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না] এই বিশ্বাসের বলে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তার চতুষ্পার্শ্বের সকল জিনিসের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখতে পারে। এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গেও একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। অতীত ও ভবিষ্যতেও এই শক্তি ছড়িয়ে আছে বলে কালের সঙ্গেও তারা নিজেদের যুক্ত বলে মনে করে। তাদের এই বিশ্বাসই তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। অশুভ শক্তি তাদের যত অসুবিধাই তৈরি করুক না কেন (রোগ শোক ইত্যাদি) তবু তারা জানে যে, তাদের কথা চিন্তা করার জন্য এক অতিলৌকিক শক্তি রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয়রা প্রবেশ করার পর অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসীদের অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে আধুনিক জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। সামান্য কয়েকটি গোষ্ঠী উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য অস্ট্রেলিয়াতে আজও তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলে। কিছুদিন ধরে আবার এই সব আদিবাসীদের অনেকেই তাদের অতীত জীবনের ধারায় স্বাধীন-ভাবে চলবার কথা চিন্তা করছে। বর্তমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে প্রাচীন বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানগুলি চলার অনুপযুক্ত সেগুলি তারা পরিত্যাগ করছে।

(৭) মাওরিদের ধর্ম: পলিনেশিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি (Maoris)-দের ধর্মের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে। হাওয়াই, নিউজিল্যাণ্ড ও ইস্টার দ্বীপের আধিবাসীরা সকলেই প্রায় একই ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে। এদের দেবদেবীও একই রকম, তবে স্থানভেদে কারো কারো কার্যক্রম ও মর্যাদা ভিন্ন।

আদি পিতামাতা সম্পর্কে মাওরিদের গল্প হল এই রকম: আদি পিতামাতা রঙ্গিনুই (Ranginui) ও পাপাতুয়ানুকু (Papatuanuku, শিব+শক্তি?)

আদিতে একাত্ম হয়ে ছিলেন অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে যুক্ত ছিলেন, (তন্ত্রের মৈথুন, বৌদ্ধদের যুগনদ্ধ ভাব)। পুত্রসন্তানের জন্ম হলেই (নির্গুণে স্বভাব তরঙ্গ সৃষ্টি হলেই, যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাদের মধ্যে ছেদ হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আসে সন্তান (অর্থাৎ সৃষ্টি, জগৎ)। পুরুষ ও প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ সন্তানেরা মাঝে মাঝে আলো দেখতে পায়ে শুধু (অর্থাৎ ইচ্ছার অভিঘাতে বিন্দু ফুটে ওঠা)। এর পর এই সন্তানেরা (অর্থাৎ সৃষ্টির আবেগ) পিতামাতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে (বিস্ফোরণে তন্ত্রের একান্ন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়)। গল্পে আছে, বেরিয়ে আসার টানে চেষ্টা করতে করতে আদি মানব-মানবীর একটি সন্তান তানে রঙ্গি (Tane Rangi)-র দিকে একটি পা বাড়িয়ে দেয়—আর হাত বাড়িয়ে দেয় পাপার দিকে। এর পরই যে সংঘর্ষ হয় (সৃষ্টির আবেগ ফেটে পড়ে) তার ফলে তার অন্যান্য ভাইয়েরা (তন্ত্রের একান্ন তরঙ্গ) বেরিয়ে আসে। পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক হয়ে যায় [তন্ত্রের নির্গুণ পুরুষ ও কুণ্ডলিনী শক্তি মৈথুন পরিত্যাগ করে পৃথক হয়ে পড়ে]। রঙ্গি তখন আকাশ হয় [এই আকাশ অর্থ নির্গুণ] আর পাপা হয় পৃথিবী মাতা [অর্থাৎ স্থূলা প্রকৃতি]। এই যুগনদ্ধ বা মৈথুনভাব কেটে যাবার জন্য চিরন্তন এক বিরহ দেখা দেয়। সেই বিরহ বৃষ্টির কান্নায় ঝরে পড়ে আর বিষাদ কুয়াশার আকারে বিষণ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আলোর জগতে প্রবেশ করেই ভাইয়েরা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতা অধিকারের লড়াইয়ে নেমে পড়ে। [তন্ত্র মতে সৃষ্টি-তরঙ্গ নানা Vibrations-এ কম্পিত হতে থাকে] তানে (Tane) হল অরণ্যের দেবতা। টাঙ্গারোয়া (Tangaroa) হল সমুদ্রদেবতা, আর টুমাতউয়েঙ্গা (Tumatauenga) হল যুদ্ধের দেবতা। কৃষিদেবতা হল রোঙ্গো (Rongo)। ভাইয়েদের মধ্যে শয়তান ছিল হুইরো (Whiro)। সে হল পাতালের দেবতা। একজন তার বাবার সঙ্গে থেকে যায়—তার নাম টাউহিরিমাতী (Tawhirimatea)। সে হল বায়ুদেবতা।

রঙ্গি ও পাপার সন্তানেরা সকলেই অমর হয়। তারা পৃথিবীর মাটি থেকে একটি রমণী মূর্তি তৈরি করে। এই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে তানে। সৃষ্টিতে এইভাবে নারীর আবির্ভাব হয়। তানে তার নাম দেয় হিনেতিতামা (Hinetitama)। এই হিনেতিতামাকে সে বিবাহ করে। তাদের সন্তানেরাই মানবজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। [তন্ত্রের ব্যাখ্যামত পাপার এই সন্তানেরা হল সূক্ষ্ম তরঙ্গ। তন্ত্রের একান্ন তরঙ্গের পঞ্চাশটি তরঙ্গ। স্থূল জগতের সৃষ্টি একান্নতম তরঙ্গ থেকে। মানুষ একান্নতম তরঙ্গের জীব]।

প্রাচীন মাওরি দার্শনিকেরা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছিলেন। এরা মন্ত্রের উপর গভীর আস্থা স্থাপন করেন। [তন্ত্রে পঞ্চাশটি বর্ণ বা অক্ষরের এর এক একটি তরঙ্গ। তরঙ্গ অনুযায়ী অক্ষরগুলিকে উচ্চারণ করা গেলে তা সেই শক্তিতরঙ্গের শক্তি লাভে সহায়ক হয়] মাওরি দার্শনিকদের মতে আদিতে কিছুই ছিল না। আমাদের শাস্ত্রের নিগুর্ণ পুরুষ বা বৌদ্ধদের শূন্যতার (Void) মতন। এই শূন্যতাকে তারা বলত 'তে কোর' (Te Kore)। এই শূন্যতার মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে ছিল তা নড়ে ওঠে। এই শক্তির নাম তে কোর কোর (Te Kore Kore, আমাদের মহামায়ার মত, ৺কালীর মত)। এর পরই শূন্যতা ঘোরতর অন্ধকারের রূপ ধরে (Te po)। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলো (Te Aomarama) ফুটে ওঠে।

মাওরিরা বৈদিক আর্যদের মত জগতের তিনটি স্তর কল্পনা করেছিল, যেমন, আকাশ (Te Rangi, বৈদিক দ্যুলোকের মত) তারপর আলোর জগৎ (Te Aomarama, অন্তরীক্ষলোকেব মত। অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে নিয়ে)। তারপর পাতাল (Te po)।

আইও (Io) হলেন সমস্ত অতীন্দ্রিয় শক্তির উৎস। তাঁর বাস ছিল দ্বাদশ স্বর্গের সর্বোচ্চ স্থানে। ফলে সমগ্র প্রাকৃত ঘটনা তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। যারা নির্জনে থেকে ধ্যান করতেন এবং গুহ্য বিদ্যাতে দীক্ষালাভ করেছিলেন তাঁরাই শুধু আইওর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন (আমাদের দেশে যেমন উচ্চকোটির সাধকেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সেই রকম)। মাওরিরা উপযুক্ত স্থানে এই আইওর সাধনা করত।

এইসব উচ্চ কোটির দেবতা ছাড়াও মাওরিরা আরও নানা শক্তির কল্পনা করেছিল, যেমন, গোষ্ঠীদেবতা বা আঞ্চলিক দেবতা, গৃহদেবতা (Kaitiaki)। এই গৃহদেবতারা পূর্বাহ্ণেই মাওরিদের বিপদের হুঁশিয়ারী দিতেন। এঁরা পরিবারের লোকদের উৎসাহও দিতেন। মাওরিদের প্রায় সব গোষ্ঠীর লোকই কোন না কোন জিনিসকে—যেমন কাঠের গুঁড়ি, বা স্রোতে ভাসমান আগাছা প্রভৃতিকে অপদেবতা বা দৈত্য-দানো বলে কল্পনা করত। এরাও মাওরিদের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। এগুলিকে মাওরিরা পবিত্র মনে করে এড়িয়ে চলত। গভীর খাদ, নদনদী, হ্রদ এ-সব জায়গাতেও এদের বাস ছিল বলে অনেকে মনে করে। কখনও এঁরা ছিলেন কল্যাণকর, কখনও ভয়াবহ। অদৃশ্য শক্তির সবই যে ভাল হয় তা নয়, কোনটা ভাল মন্দ। মৃত পূর্বপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া যদি যথাযথ না হয়—পূর্বপুরুষদের

জন্য নির্দিষ্ট-লোকে তার স্থান হয় না। সে ভ্রাম্যমাণ জীবাত্মা রূপে ঘুরে বেড়ায়। পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের রীতিমত উত্ত্যক্ত করতে আরম্ভ করে [এ ধরনের বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে]। উপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া হলে তবেই তার মুক্তি [আমাদের গয়ায় পিণ্ডদানের মত]। ভ্রূণহত্যা করা হলে তার শক্তি ভয়ানক ক্ষতিকর অপদেবতায় পরিণত হয়।

মাওরিদের কোন মঠমন্দির নেই। তবে কিছু কিছু স্থান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত থাকত। কখনও কখনও অরণ্য পরিষ্কার করে তার মাঝখানে খোদাই করা পাথর রাখা হত। মাওরি ঋষিরা এখানে বসে তাঁদের নির্দিষ্ট দেবতার সাধনা করতেন [পাথরগুলো বোধহয় তন্ত্রের পঞ্চমুণ্ডির আসনের মত ছিল]। এই পাথরগুলো মন্দির বা মূর্তি হিসেবে কাজ করত না—যথার্থই সাধকের আসন হিসেবে কাজ করত। ঐশ্বরিক সত্তা সেই পাথরে না নেমে আসা পর্যন্ত মাওরি ঋষিরা সেখানে বসে সাধনা করে যেতেন। কৃষি-অনুষ্ঠানে ঈশ্বর-দণ্ড (God-Sticks) নামে এক ধরনের দণ্ড ব্যবহার করা হত। যে-সব দেবদেবী আরাধনা করে মাওরিরা কোন ফল পায়নি তাদের পুজো-আর্চা তারা বাদ দিয়েছিল।

মাওরিদের ধর্মে বলি প্রথার তেমন প্রচলন ছিল না। তবে কখনও কখনও শক্তিশালী কোন দেবতাকে খুশি করার জন্য বলি দেওয়া হত। প্রথম শস্য মাওরিরা রোঙো দেবতার নামে উৎসর্গ করত। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহত প্রথম ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করা হত টুমাতউয়েঙ্গা (Tumatauenga)-এর উদ্দেশে। মৃত শত্রু যদি অভিজাত বংশের হত, মাওরিরা তার হৃৎপিণ্ড বা মাংস খেত। এই মাংস ভক্ষণ করে তারা মৃত শত্রুর শক্তি আত্মস্থ করতে চাইত। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ পাথর কেটে সভাগৃহ তৈরি করা হত, সেই সভাগৃহের মূল আসনের নিচে একজন ভৃত্যকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হত।

সভাগৃহের প্রাঙ্গণ খুব পবিত্র বলে বিবেচিত হত। অনুষ্ঠানের নিয়মগুলিকে মাওরিরা খুব কঠোরতার সঙ্গে পালন করত। মাওরিদের কেউ মারা গেলে এই সভাগৃহ প্রাঙ্গণে তাকে নিয়ে যাওয়া হত। এবং যতক্ষণ মৃতের আত্মার উদ্দেশে পারলৌকিক অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণ না হত ততক্ষণ মৃতদেহকে সেখানেই শায়িত রাখা হত। বেশ কয়েকদিন ধরেই অনেক সময় মৃতদেহ সেখানে থাকত। বৃহৎ পরিবার বা গোষ্ঠীর সবাই যাতে মৃতদেহ দেখতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। মৃত্যুকে মাওরিরা ভাল অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি বলে গণ্য করত। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও সমাবেশের এই স্থানটি পবিত্র বলে গণ্য হত।

মাওরিরা প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে তাকে শ্রদ্ধা করত। এবং এখনও যারা প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে আছে, তারা সেই শ্রদ্ধাকে এতটুকু হ্রাস করেনি। এরা তাবিজ-কবচেও বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করত যে, এই সব মন্ত্রপূত কবচ প্রাণশক্তি, অধ্যাত্মশক্তি, উর্বরাশক্তি ইত্যাদিকে রক্ষা করে। রক্ষা করে বন, অরণ্য ও তাদের বাসভূমিকে। কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি দিলে সেটা তার প্রাণশক্তির পরিচায়ক বলে মনে করা হত। কারও প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে এলে মনে করা হত যে, তার আত্মার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। এবার মৃত্যু আসন্ন।

মাওরিরা মনে করত যে, অধ্যাত্মশক্তি ঈশ্বরের করুণাতেই লাভ করা যায়। এ হল ঈশ্বরের দান। অধ্যাত্মশক্তি ছিল এদের কাছে বিশেষ মর্যাদার প্রতীক। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মানুষের কথাকে এরা বেদবাক্য বলে মনে করত। এই শক্তি এতই প্রবল যে, যে-কোন মানুষের ক্ষতি করতে পারে, সমাজের ক্ষতি করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

মৃত জীবদেহ হুঁশিয়ারীর প্রতীক। এর প্রতি যথাযোগ্য পারলৌকিক অনুষ্ঠান করে অদৃশ্য অনিয়ন্ত্রিত শক্তির হাত থেকে এরা রক্ষা পাবার চেষ্টা করত। এ-যেন আমাদের মৃতের উদ্দেশে অশৌচ পালনের মত। শ্রাদ্ধক্রিয়া হলে তবে আবার অশৌচ অবস্থা থেকে মুক্তি। মৃতদেহে বা তার পারলৌকিক ক্রিয়ায় ক্ষত বা খুঁত থেকে গেলে বিপদ অনিবার্য ছিল। এর কোন প্রতিকার সম্ভব ছিল না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাওরিদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত হলে অশুভ ফল হবে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যেত। এই ভুলের ফল ছিল অনিবার্য বিপর্যয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জল, আগুন ও রান্নাকরা খাবারের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এর দ্বারা অশুভ শক্তিকে দূরে রাখা যায় বলে বিশ্বাস ছিল।

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরোহিতেরা স্রোতস্বিনীতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে ক্রিয়া করতেন (আমরা যেমন গঙ্গায় তর্পণ করি, তেমনি)। এটা করা হত যে শক্তিকে তিনি আহ্বান করছেন তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে মাওরিরা পবিত্র বলে মনে করে। ফলে স্থূল জগৎ অর্থাৎ পৃথিবীও তাদের কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাওরিরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর— মাটি মায়ের (Papatuanuku) কোলে আবার তাদের ফিরে যেতে হবে। এক একটি গোষ্ঠীর অধীনে যে অঞ্চল আছে তাকে সযত্নে রক্ষা করাকে মাওরিরা বিশেষ

কর্তব্য বলে মনে করত। তাদের ধারণা ছিল যে, উত্তরপুরুষদের জন্য এই ভূমি তারা রক্ষা করে আসছে। স্ত্রীকে যেভাবে রক্ষা করা হয় মাটিকেও তারা সেইভাবে রক্ষা করত। মাটি থেকে যে শুধু তাদের খাবারই জোটে তা নয়, এই মাটি বা বাসস্থানই তাদের যথার্থ পরিচয়। ভূমিহীন ব্যক্তি মাওরিদের কাছে মানুষ বলে গণ্য ছিল না। এ ধরনের ব্যক্তি ছিল অপদার্থ। ভূমির মালিক হবার অর্থই হল মাওরি সমাজের একজন নাগরিক হওয়া—তা সে জীবনকালেই হোক বা মরণকালেই হোক।

স্বপ্ন বা অন্তর্দৃষ্টিকে মাওরিরা সূক্ষ্মজগতের নির্দেশ বলে মনে করত। স্বপ্ন দেখেই মাওরিরা পুরোহিত বা যাজকদের কাছে গিয়ে তার অর্থ জানতে চাইত। মাওরিরা মনে করত যে, নিদ্রাকালে জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করে ও আকাশ ভ্রমণ করে। এই জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মাওরিরা কখনও সহসা জাগাবার চেষ্টা করত না, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সময় না দিয়ে ঘুমন্ত দেহকে জাগাবার চেষ্টা করলে তার সূক্ষ্ম আত্মা আর দেহে ফিরে আসার সময় পাবে না। এই জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তারা খুব ধীরে ধীরে জাগাতো।

মৃত্যব্যক্তির পারলৌকিক অনুষ্ঠান মাওরিদের জীবনে বেশ দীর্ঘ ঘটনা। এই ক্রিয়া এতটা বিলম্বিত হবার কারণ, মৃতের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করা, তাকে শেষ বিদায় জানানো, শেষবারের জন্য তার সঙ্গে মেলা, এবং প্রাচীন পিতৃপুরুষদের বাসস্থানে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে যেমন নির্দিষ্ট সময় অশৌচ পালনের পর শ্রাদ্ধ হলে তবে আবার অশুচি শুচি হয় তেমনই ছিল মাওরিদেরও। মৃতের উদ্দেশে শেষক্রিয়া করা হলে তবেই তার আত্মীয়বর্গ অশৌচমুক্ত হয়।

মৃতের জন্য প্রকাশ্য জনসমাবেশে শোক প্রকাশ করার রীতি আছে মাওরিদের মধ্যে, এর কারণ, এরা মনে করে যে, কোন লোক বিশেষ এক পরিবারভুক্ত নয়, সে গোষ্ঠীভুক্ত, গোষ্ঠীর দশজনের একজন।

ইহলোকের কর্মফল অনুযায়ী পরলোকে পাপ বা পুণ্য ভোগ হয়, মাওরিদের মধ্যে এমন কোন বিশ্বাস নেই। মৃত আত্মা হয় স্বর্গে, নয় রসাতলে গমন করে। সেখানে জীবিতকালে তার যে জীবনধারা ছিল সেই জীবনধারাই অনুসৃত হয়। গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ হতে পারে। মৃতের রাজ্যকে মাওরিরা বলে রারোহেঙা (Rarohenga)। এ অঞ্চলে পাহারা দেয় হিনেনুইও-তেপো (Hinenuiotepo) বা মহান হিনে (Hine)। তার ছাড়পত্র নিয়ে তবেই মৃত্যুলোকে যেতে হবে। এই হিনেনুইওতেপো মূলত হল হিনেতিতামা (Hinetitama) যাকে দেবতা 'তানে' নিজে তৈরি করে বিবাহ করেছিলেন।

ইনি স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে রসাতলের বা মৃত্যুলোকের অধিশ্বরী হন।

মাওরিদের নানা অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে সত্যতা থাকলেও মৃত্যুলোক বা জীবাত্মা সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। স্থূলদেহের ঊর্ধ্বে জীবের পাঁচটি সূক্ষ্ম-দেহই তার কর্মফল অনুযায়ী অর্থাৎ কামনা-বাসনা অনুযায়ী এক একটি স্তরে স্থান লাভ করে। যার কামনা-বাসনা বেশী, স্থুল জগতের কাছাকাছি থাকে সে, যার কম সে লঘুতা প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্মতর দেহে ঊর্ধ্বে থাকে। মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে তার দেহ মৃত্যুকালে যে রকম ছিল সেই দেহের মতই থাকে। যোগীরা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাদের এই সূক্ষ্ম দেহগুলিকে সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থিত দেখতে পান।]

(৮) **মাদাগাসকারের অধিবাসীদের ধর্মসাধনা**ঃ—মাদাগাসকার আফ্রিকার খুব কাছাকাছি হলেও এর অধিবাসীরা মূলত এশীয়। এদের ভাষা মালয় ও পলিনেশিয়ার লোকেদের ভাষার মত। আমরা 'ধর্ম' বলতে যা বুঝি এখানকার লোকদের সেই অর্থে 'ধর্ম'শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। ধর্ম বলতে এরা বোঝে প্রাচীন নিয়মকানুন বা পূর্বপুরুষদের নিয়মকানুন। এদের বর্তমান সংস্কৃতি ইউরোপীয় ও আরবীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এখনও প্রাচীন বিশ্বাস তাদের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এদের কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম-বিশ্বাস নেই, ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীও কম।

মাদাগাসকারের কেন্দ্রস্থলে বারটি পাহাড় আছে। আগে এখানে বারজন রাজা ছিলেন। এই বারটি পাহাড়কে মাদাগাসকারের লোকেরা খুব সমীহ করে। এখানকার প্রাচীন অধিবাসী (Vazimba)-দের কবরগুলিও মাদাগাসকারবাসীদের চোখে খুব মূল্যবান। এরা প্রায় অর্ধপৌরাণিক কাহিনীর মানুষে পরিণত হয়েছে। এদের কবর নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোথাও বা কবরগুলি রয়েছে অরণ্যের গভীরে, কোথাও বা কবরের উপরে রয়েছে খোদাই করা দণ্ড বা বৃষ মস্তিষ্ককঙ্কাল। এই বৃষগুলিকে মৃতের উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অনেক জায়গায় খাড়াখাড়ি পাথর দাঁড়িয়ে আছে। এতে পূর্বপুরুষদের কাহিনী বিবৃত আছে। গাছগাছালি, পাথর, ঝর্ণা, নদনদী এই সব প্রকৃতির জিনিসগুলিও যেমন পুজোর স্থান, তেমনি এই কবরগুলিও। বরং ধর্মস্থান হিসেবে কবরের মূল্যই মাদাগাসকারের লোকেদের কাছে বেশী। মাদাগাসকারের কোন কোন গোষ্ঠীর লোকের ধর্মচর্চা-গৃহও আছে। এর মধ্যে আরাধ্য বস্তুটিকে রাখা হয়। এই গোষ্ঠীর প্রত্যেকের গৃহেই অনুরূপ বস্তুটি দেখা যায়। অনেক গ্রামেই

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে ধর্মদণ্ড (Sacred Pole) আছে। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রত্যেকটি পবিত্র স্থানেরই একটি অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে বলে মাদাগাসকারের লোকেরা মনে করে [আমাদের পীঠস্থানগুলিতে যেমন স্থানমাহাত্ম্যে এক এক স্থানে এক একটি শক্তিতরঙ্গের অনুরণন আছে।] মনুষ্য কর্তৃক তৈরি নানা জিনিসের মধ্যেও অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, মাদুলি। এই মাদুলি ধারণ করা হলে অশুভ শক্তি ও তুকতাককারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আগে মাদাগাসকারের যোদ্ধারা মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ পরে যুদ্ধে যেত। রাজারাও সিংহাসন আরোহণকালে মন্ত্র দ্বারা রক্ষাকবচ পরে নিতেন। এই মন্ত্রপূত কবচ মানুষের মাধ্যমে রাজাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিত। মানুষের আকৃতিসম্পন্ন কিছু রক্ষা-কবচও আছে। তাকে যে তাই বলে মাদাগাসকারের লোকেরা দেবতা বলে পুজো করত তা নয়। হয়তো বা বর্শার গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে বা মসৃণ কাঠের দণ্ডে কাপড় জড়াতে জড়াতে তা মনুষ্যাকৃতি গ্রহণ করেছে। এর উপর আবার হয়তো রুপার অলংকার বসানো হয়েছে। আমাদের দেশের অনেক সাধুসন্ত যেমন অলংকারাবৃত লাঠি সঙ্গে রাখেন তেমনই। ১৮৬৯ খ্রীঃ মাদাগাসকারের প্রধান প্রধান গুণিনদের পুড়িয়ে মারা হয়। তবুও তাদের স্মৃতি এ-দেশের লোকের মন থেকে মুছে যায় নি।

মাদাগাসকারের লোকেদের কাছে কিছু কিছু জন্তু-জানোয়ারও অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতীক। যেমন কুমীর। অনেক জায়গায় কুমীর নিয়ে গান আছে। কুমীরের সম্মানে ভোজসভারও আয়োজন করা হয়। কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে বেড়াল আর পেঁচা অমঙ্গলসূচক। অনেকে আরবদের প্রভাবে শূকরকে অচ্ছুৎ বলে মনে করে।

মাদাগাসকারের লোকেরা মনে করে যে, মানুষের কাছে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে টেনে আনা যায়। তবে এই শক্তিকে টেনে আনার আগে আটঘাট বেঁধে নিতে হয়। অতীন্দ্রিয় শক্তিকে কেউ যদি টেনে আনতে চায়, সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে বিপর্যয় অনিবার্য।

মাদাগাসকারে এমন অনেক লোক আছে, যারা মঠ-মন্দির বা থান-এর রক্ষক হিসেবে বা পূজারী হিসেবে বা পাণ্ডা হিসেবে কাজ করে। শস্যবীজ মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে (কড়ি ছড়ানোর মত) তারা ভবিষ্যৎ গণনা করে। এইভাবে তারা রোগ সারায়, তুকতাকের হাত থেকে রক্ষা করে, ভাগ্য গণনা করে এবং সাধারণ মানুষকে

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য করে। আমাদের দেশে যেমন জমিদার বাড়ি বা বড়লোকের বাড়িতে পূজারী ব্রাহ্মণ থাকে মাদাগাসকারের বড়লোকদেরও তেমনই ঘরে বাঁধা গুণিন ধরনের লোক থাকে। এরা গৃহস্থকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দান করে। অনেক অঞ্চলে দল বেঁধে লোকে নেশা করে অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় [এখনও আমাদের দেশের নীচু শ্রেণীর সাধুরা সাধনার অঙ্গ হিসেবে গাঁজা খায়]। অনেক সময় অনেক লোকের উপর ভরও হয়। এরা তখন ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন কণ্ঠে কথা বলে, লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেয়। জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় বা কোন বৈপ্লবিক ঘটনার সময় মাদাগাসকারবাসীরা বাধানিষেধের প্রাচীর টপ্‌কে উন্মত্ত নৃত্য শুরু করে দেয়।

মাদাগাসকারবাসীদের কাছে প্রত্যেকটি মানুষই মূল্যবান। কারণ, তার মধ্যে আত্মা আছে। সমস্ত মানুষ, শক্তি, পূর্বপুরুষ (অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহী) সবার উর্ধ্বে রয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টারূপী ভগবান। এই ভগবান অর্থাৎ অন্দ্রিয়ামানিত্রা জানাহারি (Andriamanitra Zanahary) অনেক দূরে থাকেন, কিন্তু মঙ্গলময়।

ইউরোপীয়রা আসার আগে মাদাগাসকারে আরবদের প্রভাব ছিল বেশি। এরা দিনক্ষণ বিচার করার জন্য আরব পঞ্জিকা ব্যবহার করত। এক একদিন এক এক কাজের জন্য নির্ধারিত থাকত। এমন অনেক দিনক্ষণ ছিল যে সময় শিশু জন্মালে অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় সেই সময় ও লগ্নে কোন শিশু জন্মালে মাদাগাসকারের লোকেরা তাকে শিশুকালেই মেরে ফেলত।

গ্রীষ্ম শেষে নববর্ষ আরম্ভ হলে স্থানীয় রাজা অনুষ্ঠান-স্নান করতেন। রাজার পবিত্র দেহের স্নান করা জল চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিয়ে ভূমির উর্বরা শক্তি ও পশুপাল বৃদ্ধি কামনা করা হত। বলির পশুর রক্ত দুয়ারে ছড়িয়ে দেওয়া হত। নববর্ষে বিবাদ-বিসংবাদ থাকলে তা মিটিয়ে নেওয়া হত। এখন মাদাগাসকারে কোন রাজা না থাকলেও প্রচলিত নববর্ষরীতির অনেক নিয়মই বেঁচে আছে।

মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া মাদাগাসকারে একটি বড় অনুষ্ঠান। এ সময় পশুবলি দেওয়া হয়। ইমেরিনা (Imerina) নামক স্থানে সমাধি থেকে পূর্বপুরুষদের হাড় বের করে তা নিয়ে বাড়ির চারদিকে বছরে একবার করে নৃত্য করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, বৎসরে একবার এইভাবে বেরিয়ে আসতে পেরে মৃত পূর্ব-পুরুষেরা আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে অধস্তন পুরুষেরা এক বছরের জন্য নিজেদের নিরাপদ বোধ করে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় ফামাদিহানা (Famadihana) বা হাড় বের করা।

গৃহ-জীবনেও মাদাগাসকারবাসীদের নানা অনুষ্ঠান আছে। আমাদের দেশের মত জন্ম-লগ্ন বিচার করে—গণৎকারের সাহায্যে সন্তানের নামকরণ করা হয়। শিশু জন্মানোর পর মা পবিত্র অগ্নি-লঙ্ঘন করে নিজেকে পবিত্র করেন। আমাদের দেশেও অশৌচ কাটিয়ে নবজাতককে গৃহে আনা হয়। নির্দিষ্ট একটি বয়সে ছেলেদের ছুন্নৎ হয়। ছুন্নৎ না হলে কেউ যথার্থ মানুষ হতে পারে না—যেমন উপনয়ন না হলে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হতে পারে না। ছুন্নৎ উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজ ও নাচগান হয় (আমাদের দেশে যেমন পৈতে উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে)। রজঃস্বলা হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বয়স্কা রমণীর পোশাক পরানো হয়। বাকদান হলে সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হয়। মাদাগাসকারে মেয়েদের বা মায়েদের প্রধান কাজ হল সন্তান ধারণ করা ও পালন করা। গর্ভবতী রমণীদের নানা অনুষ্ঠান করতে হয়। যেমন, পবিত্র পাহাড়ে ওঠা, ডাইনীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, বাৎসরিক পূর্বপুরুষদের মৃতদেহের হাড়গোড় তোলার সময় তাদের গাত্রাবরণের সামান্য অংশ ও মাংসের সামান্য টুকরো সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

পারলৌকিক ক্রিয়ায় মস্তক মুণ্ডন করে পরিবারশুদ্ধ লোক স্নান করে (হিন্দুরাও করে)। দীর্ঘদিন ধরে শোকপ্রকাশ চলে [আমরা যেমন মাসাবধি অশৌচ পালন করি ও ক্ষৌরকর্ম করি না]।

বিপদে পড়লেই মাদাগাসকারবাসীরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পশুবলি দেয়। পবিত্র স্থানগুলিতেও বলি দেওয়া হয়। ষাঁড় বলি দেওয়াই হল বড় বলিদান। ছোট ছোট ক্ষেত্রে মুরগী বলি দিলেও চলে। অনেক ক্ষেত্রে ভাত, মধু, মদ, আখ, মিষ্টি ইত্যাদিতেও কাজ হয় (আমাদের পুজোর নৈবেদ্যর মত)। সাবধানী পর্যটকেরা নদী অতিক্রম করবার সময় নদীতে পয়সা ছুঁড়ে দেয় (আমরা যেমন গঙ্গা প্রণাম করি)। অনেকে পবিত্র বৃক্ষে কাপড়ের টুকরো বাঁধে [বৃন্দাবনের বস্ত্রহরণ ঘাটে যেমন হিন্দুরা বাঁধে]। দাঁড় করানো পাথরের উপর অনেকে মুখভর্তি মদ নিয়ে ছিটিয়ে দেয়।

আগে বিষ দিয়ে দোষী-নির্দোষী প্রমাণ হত। [প্রাচীন ভারতেও বিষ পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা এ-সব ছিল]। এখন এ ব্যবস্থা উঠে গেছে। বন্ধুরা ফতি-দ্রা (Fati-dra) উৎসবে রক্ত বিনিময় করে অর্থাৎ একের রক্ত অপরের দেহে ঢুকিয়ে দেয়। কোন বাধানিষেধ ভেঙে ফেললে, বা দুঃস্বপ্ন দেখলে লোকে গণৎকারের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানতে যায়।

গল্পচ্ছলে বা কিংবদন্তীর সাহায্যে কিংবা প্রবাদবাক্যের সাহায্যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এ জন্য শত শত প্রবাদ বাক্য শিখতে হয়। এই প্রবাদবাক্যগুলিই জীবনের নীতিনির্ধারক। নির্দিষ্ট নীতিবৃত্তে চলতে পারলে মাদাগাসকারবাসীরা পরিতৃপ্তি লাভ করে, মনেও শান্তি পায়। নিজের খেয়ালখুশি মত চলাটাকে তারা বনবেড়ালের জীবনের মত মনে করে।

(৯) আফ্রিকার আদিবাসীদের ধর্ম: দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ আদিবাসী বান্টু ভাষাতে কথা বলে। নানা জাতির সংমিশ্রণে এই বান্টু ভাষাভাষী লোকের উদ্ভব ঘটেছে। নানা পরিবেশের মধ্যে এরা থাকে যেমন বৃষ্টিবিধৌত অরণ্য থেকে মরুভূমি অঞ্চল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ জাইরে (Zaire) বালুবা, ন্‌ডেম্বু (Ndembu) সোথো স্বানা (Sotho-Tsaana) জুলু (Zulu) শোনা (Shona) এবং কিকুউ (Kikuyu) প্রভৃতি।

অন্যান্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীও আছে, যেমন খাইশান (Khyishan) নিলোটিক (Nilotic) প্রভৃতি।

আদি বৈদিক যুগের বেদের মত আফ্রিকার আদিবাসীদের ধর্মও যুগে যুগে চলে এসেছে। বংশ পরম্পরায় মৌখিকভাবেই এই ধর্ম এগিয়ে চলেছে। শিশুরা এখানে বড়দের কথাকে বেদবাক্য বলে মনে করে। এবং মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে। বয়োবৃদ্ধদের এই মৌখিক নির্দেশ ছাড়া এদের কোন লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। বয়োবৃদ্ধদের কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয় তো কোন কিছুই আফ্রিকা-বাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তবে প্রাচীন ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় এগিয়ে আসতে আসতে এর মধ্যে নানা রূপান্তর ঘটেছে। যেমন, ন্‌কোঙ্গোলো (Nkongolo), ন্‌বিডি (Nbidi) কিলুবে (Kiluwe) ও কালালা ইলুঙা (Kalala Ilunga) গল্প। বালুবা উপগোষ্ঠীর নানা গোষ্ঠীর কাছে একই গল্প নানা ভাবে বর্ণিত হয়েছে [উপনিষদেও এইভাবে একই গল্প নানাভাবে বর্ণিত আছে]। প্রাচীন কাহিনীর নানা রূপান্তর ঘটলেও আফ্রিকার আদিবাসীরা যে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেছে, তা নয়। কিছু কিছু রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়েছে। তবে সে পরিবর্তন দ্বারা এই বোঝায় না যে, আফ্রিকানরা তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। তবে চিরকাল সর্বদেশে সর্বকালেই কাহিনীর কিছু রূপান্তর ঘটে। আমাদের দেশের পুরাণ ও মহাভারতেও এমন অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আদি কাহিনীতে পরবর্তিকালে অনেক কিছুই সংযোজিত হয়েছে।

আফ্রিকার গোষ্ঠী সমাজ একই ঐতিহ্য অনুসরণ করে, এবং একই কাহিনীতে বিশ্বাস করেই এক সমাজভুক্ত থাকে। বালুবারা পরস্পর পরস্পরকে ন্‌কোঙ্গোলো, ম্‌বিবিডি কিলুবে ও কালালা ইলুঙ্গা (Nkongolo, Mbidi Kiluwe and Kalala Ilunga)-র গল্প বলে।

আফ্রিকার ধর্মে গোষ্ঠী প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তাদের গোষ্ঠীসমাজে ব্যক্তির নিজস্ব কোন মূল্য নেই। সমাজভুক্ত বলেই তার মূল্য। কাউকে সমাজচ্যুত করা হলে সে এই ঘটনা অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করবে। তবে যত গোষ্ঠী-সমাজ, আফ্রিকাতে ধর্মের সংখ্যাও ততই।

আফ্রিকার লোকেরা প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত জিনিস অপেক্ষা মানুষের মূল্য বেশী দেয় [ভারতীয় তন্ত্রেও মানুষের মূল্য সর্বাধিক। সৃষ্টি বিকশিত হয়ে তার চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করেছে মানুষের আবির্ভাবে। এই মনুষ্যদেহ এমনভাবে তৈরি যে, যার সাহায্যে উৎসের যথার্থ ঠিকানা মানুষ পেতে পারে। এবং এই দেহের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় প্রাণীরা অর্থাৎ দেবদেবীরা বিশ্বজগতে এক একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন বলে মোক্ষ লাভে তাদের বিলম্ব হয়। এই অর্থে মানুষ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বলা হয়েছে যে, যা নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে] সমাজে মানুষের মূল্যমান আরও বাড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

বাণ্টুভাষীদের কথায় মানুষকে বলা হয় মুণ্টু (Muntu)। মুণ্টুর বহুবচনই হল বাণ্টু।

আফ্রিকানদের মতে জন্ম হল মানুষ হবার শুরু মাত্র। শিশু জন্মালেই তার একটা নামকরণ প্রয়োজন। সাধারণত এই নাম পূর্বপুরুষদের অথবা কোন শক্তির নামে রাখা হয়। আফ্রিকানরা বিশ্বাস করে যে, প্রাক্তন পুরুষেরা অধস্তন পুরুষের রূপ ধরে নতুন করে জন্মগ্রহণ করে। কোন প্রাক্তন পুরুষ এই শিশুরূপে জন্মেছে এটা অনুমান করে সেই হিসেবে তার নাম রাখা হয়। নামকরণের পূর্বেই যদি কোন শিশুর মৃত্যু হয় আফ্রিকানরা তাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। মনে করে যে, কোন শক্তি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। দেখতে স্বাভাবিক নয় এরূপ লোককে আফ্রিকানরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। ফলে তার সঙ্গে ব্যবহারও আলাদাভাবে করা হয়। বিকৃত অঙ্গ, বিকৃত দন্ত ও যমজ সন্তানদের তারা অস্বাভাবিক বলে ভাবে। অনেক জায়গায় যমজ সন্তানকে মেরে ফেলা হয়। কোথাও কোথাও তারা আবার বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। কারণ, যমজ সন্তানকে

এরা দেবতা বলে মনে করে। বালুবারা মনে করে যে, যমজ সন্তান হল একই রক্তের মৈথুনাবদ্ধ প্রাণী। ফলে তারা ন্‌কোঙ্গোলোর সঙ্গে যে সময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।

আফ্রিকাবাসী আদিবাসী শিশুরা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় দীক্ষা গ্রহণের পর। বালুবারা পুরুষ ছেলের দীক্ষাগ্রহণকে বলে মুকাণ্ড (Mukanda)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই দীক্ষা দেওয়া হয়। দীক্ষাকালে প্রথমদিকে মা এবং অন্যান্য মহিলাদের কাছ থেকে তাকে পৃথক করে রাখা হয়। এই সময় ছুন্নৎ করে তাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে শিবিরে রাখা হয়। এখানে তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয় রীতিতে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষা শেষে তারা প্রথমে ফিরে এসে সমাজজীবনে অংশ গ্রহণ করে [বৈদিক কালে যেমন ব্রহ্মচর্য পালনান্তে আর্যরা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত, তেমনি]।

এই একই ধরনের দীক্ষাপ্রথা অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত আছে। অনেকে এই দীক্ষা নেয় অনাড়ম্বর ভাবে, ছুন্নৎ না করেই। কুমারীদের দীক্ষা দেওয়া হয় তারা রজঃস্বলা হলে। কোন কোন গোষ্ঠী কুমারীদের দীক্ষাদানকে নানা জটিল নিয়মকানুনে বেঁধে রেখেছে।

দীক্ষা হলে তবেই আফ্রিকান নরনারী বিবাহ করতে পারে। অদীক্ষিতরা বিবাহ করলে সেটা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত দীক্ষান্তেই আফ্রিকানদের বিবাহ হয়। আফ্রিকান নরনারীদের বিবাহ হয় নি এমন প্রায় শোনাই যায় না। পাগল না হলে সবারই বিবাহ হয়। বিবাহ কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়, পারিবারিক বিবাহ। এর অর্থ এই নয় যে, যে বিয়ে করবে তার নিজস্ব কোন বাছবিচার বা পছন্দ অপছন্দ থাকবে না। তবে পারিবারিক পছন্দের মূল্যই বেশি (ভারতবর্ষে অদ্যাবধি পারিবারিক পছন্দই বিবাহের ক্ষেত্রে বড় ব্যাপার]। ভারতবর্ষে যেমন বিবাহের অর্থ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' আফ্রিকানদের ক্ষেত্রেও তেমনিই। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের জন্যই বিবাহ।

সন্তান লাভ করা জীবনের একটা বড় ব্যাপার। সন্তানহীনদের জীবন ব্যর্থ বলেই ধরা যেতে পারে [ভারতেও তাই]। কারণ, পুত্র না থাকলে পিতামাতা প্রাক্তনপুরুষদের মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। [ভারতীয়দের মতে মুখাগ্নির অভাবে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে না]। তাছাড়া সমাজেও তারা অপাঙ্‌ক্তেয় বলে বিবেচিত হবে। (ভারতীয়দের মধ্যেও নিঃসন্তান মহিলা অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না)।

জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে। আফ্রিকানরা জানে যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবু মৃত্যুকে তারা স্বাভাবিক বলে মনে করে না। অনেক আফ্রিকাবাসীই মনে করে যে, ঈশ্বর মানুষকে চিরকাল বাঁচার জন্যই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কোন ভুলে অকস্মাৎ মৃত্যু এসে যায়। গল্প আছে যে, ঈশ্বর মানুষকে জীবনের বাণী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাণী পাঠিয়েছিলেন ধীরগতি প্রাণীর মাধ্যমে যেমন, গিরগিটি। এরপর মৃত্যুর বাণী পাঠান। সে বাণী পাঠান দ্রুতগতি টিকটিকির মাধ্যমে। টিকটিকি গিরগিটির আগে এসে উপস্থিত হয়। যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল মানুষকে অনন্ত জীবন দান করবেন, তবু তা হয়ে ওঠে না। মৃত্যুর বাণীই মানুষ আগে লাভ করে।

মৃত্যু নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত জিনিস নয়। তবু অনেক সময় মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণতা বলে মনে করা হয়। এ রকম মনে করার কারণ এই যে, আফ্রিকানদের ধারণা, মৃত্যুর পর তারা পরলোকে পূর্বপুরুষ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সাধারণ ধারণা, মৃত্যুলোক হল পাতালে কিংবা এমন এক দেশে যেখানে আমাদের পার্থিব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে (এ বিশ্বাস অতীব সঙ্গত। মানুষ মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ না করা পর্যন্ত দেহের উর্ধ্বে যে পাঁচটি সূক্ষ্মদেহ আছে তার মধ্যে সংস্কার অনুযায়ী বাস করে। যার কামনা-বাসনা যত কম হয় সে তত সূক্ষ্মতর দেহে বাস করে। যে সূক্ষ্মজগতে মানুষের অনুরূপ দেহ নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়, সেই জগৎ অনেকটা কাচের ঘরের মত। এ হল আত্মারই এক পর্যায়, যে পরমাত্মার চরিত্র স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। যোগীরা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে সূক্ষ্মজগতের সেই সূক্ষ্মতর জীবাত্মাগুলিকে দেখতে পান)। তবে সব আত্মাই যে পূর্বপুরুষের মর্যাদা লাভ করতে পারে তা নয়। যাদের সন্তান আছে, যারা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে ও যাদের নিয়মমাফিক সমাধিস্থ করা হয়েছে একমাত্র তারাই পূর্বপুরুষের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। নিঃসন্তান, দুর্ঘটনায় মৃত, বিদেশে মৃত, ডাইনী দ্বারা তুকতাকে মৃত ব্যক্তির আত্মাগুলি অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবিত মানুষের ক্ষতির কারণ হয় (এ ধরনের বিশ্বাস ভারতীয়দেরও আছে।)

উদার ও দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির আত্মা যে পাতালেই থাকে তা নয়। উঠে এসে জীবিতদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখে। মৃতের সমাধিস্থলই হল জীবাত্মার সঙ্গে যোগাযোগের স্থান। অধস্তন পুরুষেরা এখানে খাদ্য ও পানীয় দান করে (ভারতীয়দের ভাষায় পিণ্ড দান করে)। এই সমাধি ছাড়া জীবাত্মা-গৃহ বা বেদী আছে। সেখানেও মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সমাধির কাছে সাপ বা কোন প্রাণীকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকে তাদের

পূর্বপুরুষদের আত্মা বলে ভাবে। আফ্রিকানরা বিশ্বাস করে যে, মৃত আত্মা আবার জন্মাতে পারে অর্থাৎ তারাও ভারতীয় হিন্দুদের মত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে।

জীবন ও মৃত্যু আফ্রিকানদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানুষ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই যাতায়াত করতে পারে। পুনর্জন্মে মৃতব্যক্তি আগের মতই হয়ে জন্মায় না। নবজন্ম হবার পরেও মৃত ব্যক্তিকে পরলোকে দেখা যেতে পারে। (এ রহস্য যোগীদের কাছেও জ্ঞাত। পরমাত্মার যে স্বরূপ তারা জেনেছেন তা হল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। তার চরিত্র হল অনেকটা ফটোর নেগেটিভের মত। মানুষের প্রতিটি চিন্তাতরঙ্গ ও কর্ম তাতে রেখাচিত্র অঙ্কন করে যায়। ফলে তার সমগ্র জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকাংশ সেখানে অদৃশ্যভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। যা পরমাত্মাতে চিত্রিত হল তা আর মুছে যাবার নয়। প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত তা সেই ভাবেই চিত্রিত থাকবে। মৃত ব্যক্তির সুক্ষ্মদেহ পুনর্জন্ম লাভ করলেও সুক্ষ্মাত্মা হিসেবে সে পরমাত্মার নেগেটিভে যে ছাপ সৃষ্টি করে গেছে তা থাকবেই। এই কারণেই অতি প্রাচীন কালের ঘটনাবলির দৃশ্য যোগীদের চোখে পড়ে যায়। আবার কর্মফলজাত কম্পনে যে ভবিষ্যৎ জীবনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এই কারণে একজন যোগী মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন। ফলে আফ্রিকানদের এ ধারণাও ভ্রান্ত নয় যে, নবজন্মের পরেও আত্মার অস্তিত্ব পরলোকে থেকে যায়। এ যেন টেপ রেকর্ডের গান, মুছে না ফেলা পর্যন্ত থাকবেই। এবং সেই একই টেপে পূর্বগান সহ আরও নতুন গান ধরা যেতে পারে। সেই রকম প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত জীবের সকল ভূমিকাই পরমাত্মায় বিধৃত থেকে যায়)।

আফ্রিকানদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তির আত্মা জন্তু-জানোয়ারের আকারে দেখা দেয়। এক পূর্বপুরুষের আত্মা একই সঙ্গে অধস্তন কয়েকজন পুরুষের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করতে পারে বলেও তারা বিশ্বাস করে। সুতরাং মৃত্যু মানেই আফ্রিকানদের কাছে মৃত্যু নয়। ভারতীয়দের কাছেও তাই। সেই জন্য গীতায় বলা হয়েছে 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।'

আফ্রিকানরা মনে করে যে, জন্ম হয় নামের। আফ্রিকানদের নাম শুধুমাত্র নাম নয়, নামের মধ্যে থাকে জাতকের চরিত্রের পরিচয়। অর্থাৎ নামই হল তার রূপ। যাকে আমরা বলি 'নাম ও রূপ'। পূর্বপুরুষের নাম হওয়া মানেই আফ্রিকানদের মতে সেই পূর্বপুরুষই হওয়া। এই নামের গুণে পূর্বপুরুষের নানা গুণ অধস্তন পুরুষেও বর্তাবে, তার মর্যাদাও নামধারীর উপর এসে পড়বে। [ভারতীয়রাও

মনে করে যে, রাশি লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি অনুসারে অর্থাৎ জীবের vibration অনুসারে তার নাম হয়। এবং নাম অনুসারেই সে কর্ম করে থাকে। বর্তমানে অবশ্য নামের বিপরীত কর্ম অনেকেই করে থাকেন তার কারণ নামকরণের সময় তার জন্মক্ষণ রাশি লগ্ন ইত্যাদি বিচার করা হয় না।]

প্রাক্তন পুরুষ ও বর্তমান পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক হল আফ্রিকানদের ঐতিহ্যজাত বিশ্বাস। পূর্বপুরুষেরা যে শুধু কিংবদন্তী বা পুরাণ কাহিনী, অনুষ্ঠানরীতি, ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন এবং বিশ্বাসই উত্তরপুরুষদের দিয়ে যান তা নয়, তাদের নাম এবং সত্তাও দিয়ে যান। যা সত্য তা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আসে।

পূর্বপুরুষেরা বিশেষ বিশেষ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক পূর্বপুরুষ যেমন আছে, তেমনই আছে সামাজিক বা গোষ্ঠীগত পূর্বপুরুষও। গোষ্ঠীগত পূর্বপুরুষ বা গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের বালুবারা বলে উন্নত প্রাণী—ববিদ্যে Bavidye. প্রাকৃত কতকগুলি জিনিস ও প্রাক্তন বীরপুরুষদের সঙ্গে তারা যুক্ত। লুবা কাব্যে এদের এক ধরনের সূক্ষ্মাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা হল প্রকৃতির শক্তি। কোন সময় মানুষের দেহে প্রবেশ করেছিল। যেমন ন্‌কোঙ্গোলো হলেন রামধনু এবং প্রাচীন একজন গোষ্ঠীপ্রধান।

লুবা কাব্যে বা মহাকাব্যের গল্প হল এই ধরনের: জাইরের (Zaire) দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যভাগে লাল চামড়াওয়ালা একদল লোক বাস করত। এদের নাম ছিল কলঙ্গা (Kalanga). জল, পাহাড় ও গাছগাছালিতে যে শক্তি থাকত এরা তাদের উপাসনা করত। কিন্তু এই প্রাকৃত শক্তি আরাধনা করে এদের মধ্যে অনেকেই হতাশ হন। কারণ, মানুষের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে এদের কিছুতেই তারা যুক্ত করতে পারেন না। তবে এই প্রাকৃত শক্তিগুলির মধ্যে পাহাড়ে বসবাসকারী একটি শক্তিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানুষের কাছে আনা হত, এই শক্তি তখন মুজিবু নামে এক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এই মুজিবুই প্রথম কিলুম্বু (Kilumbu) হয়, অর্থাৎ যার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃত শক্তি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে [আমাদের দেশে ভর হয় এই ধরনের কোন শক্তি মানুষের দেহে প্রবেশ করলে]।

এই ঘটনার আগে আফ্রিকায় কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এই সময় একজন তরুণ আফ্রিকান—ন্‌কোঙ্গোলো (Nkongolo) একদিন কালো পিঁপড়ে ও সাদা পিঁপড়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পান। এতে সাদা পিঁপড়েগুলি পরাজিত হয়। ন্‌কোঙ্গোলো তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কি করে হল ? তার বাবা উত্তর

দেন যে, কালো পিঁপড়েরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকার জন্য ও সাদা পিঁপড়েদের প্রতি করুণা প্রদর্শন না করার জন্যই জয়লাভ করেছে। ন্‌কোঙ্গোলো তখন কালো পিঁপড়েদের উদাহরণ অনুসরণ করে একদল যোদ্ধাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ও তাদের শত্রুদের প্রতি কোনরকম করুণা প্রদর্শন করে না। এদের সাহায্যে সে বিরাট এক অঞ্চলের অধীশ্বর হয়।

তবে ন্‌কোঙ্গোলো ছিল অত্যাচারী। নিজের পরিবারের লোক ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করত না। এ-জন্যে লোকে তাকে ঘৃণা করত। ন্‌কোঙ্গোলো নিজের মা ও বোনদের নিয়ে বাস করত। বোনদের মধ্যেই একজনকে সে বিয়ে করেছিল। তবে মুজিবু তাকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে জানিয়ে দিয়েছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই পূর্বদেশ থেকে এক আগন্তুক এসে নতুন রাজবংশ স্থাপন করবে।

একদিন ন্‌কোঙ্গোলোর বোনেরা একটি হ্রদের ধারে মাছ ধরার সময় একজন শিকারীকে দেখতে পায়। তার গায়ের রঙ ছিল অত্যন্ত কালো। তবে সে অভিজাত বংশের ছিল বলে মনে হয়। বোনেরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভাইকে এই খবর দেয়। ন্‌কোঙ্গোলো সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় যে, এই শিকারীই পূর্ব দেশাগত সেই আগন্তুক [গল্পটির মধ্যে কংস ও কৃষ্ণের ছায়া আছে। কংসও ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন যে, 'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' কংস সেজন্য গোকুলবাসী নবজাতকদের হত্যার লীলায় উন্মত্ত হয়েছিলেন। কংসের বর্ণ ছিল গৌর। তার নিধনকারী কৃষ্ণের বর্ণ কালো বা শ্যাম।] সে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করার জন্য যোদ্ধাদের পাঠিয়ে দেয়। যোদ্ধারা তাকে খুঁজে পায় না। কিন্তু ন্‌কোঙ্গোলোর বোনেরা ফিরে এসে আবার সেই শিকারীকে দেখতে পায়। ন্‌কোঙ্গোলো তখন সেই শিকারীর সঙ্গে তার বোনেদের বিয়ে দেন। শিকারীর নাম ছিল ম্‌বিডি কিলুবে (Mbidi Kiluwe) [কৃষ্ণের পিতাও কংসের ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করেছিলেন]। ম্‌বিডি কিলুবের কতকগুলি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। সে খেতে বসত একা। তার রান্না বিশেষ এক ধরনের আগুনে করতে হত। মুজিবু জানান যে, এই ব্যক্তিই পূর্বনির্দিষ্ট সেই পূর্বদেশাগত আগন্তুক।

একথা জানতে পেরে ন্‌কোঙ্গোলো ম্‌বিডি কিলুবেকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ম্‌বিডি কিলুবে তা বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টা করে। তার স্ত্রীরা তখন গর্ভবতী হয়েছে। ম্‌বিডি কিলুবে তাদের কয়েকটি বিশেষ তীর হাতে দিয়ে বলে যে, তোমাদের ছেলেরা বড় হয়ে আমার সাহায্য প্রয়োজন বোধ

করলে এই তীরগুলি দেখালেই আমি তাদের চিনতে পারব। এর পর সে পূর্বদেশে নিজের রাজ্যে ফিরে যায়।

ম্‌বিডি কিলুবের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। তার নাম ইলুঙ্গা- (Ilunga)। ইলুঙ্গা বিরাট যোদ্ধাতে পরিণত হয় ও তার মামাকে রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করে। সে যুদ্ধে এত সাফল্য অর্জন করে যে, তার উপাধি হয় কালালা (Kalala) বা বিজয়ী। এতে ন্‌কোঙ্গোলো ঈর্ষা বোধ করতে থাকে এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে [মামা ভাগ্নেকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কংস ও কৃষ্ণের গল্পের সঙ্গে মিল আছে]।

ন্‌কোঙ্গোলো তখন বিজয়োৎসব নৃত্যের আয়োজন করে ইলুঙ্গাকে তার নেতৃত্ব নিতে বলে। নাচের আসরের মাঝখানে একটি গর্ত করে তাতে উর্ধ্বমুখী করে বর্শা সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর তা ঢেকে দেওয়া হয়, ইলুঙ্গা সেখানে গেলেই যাতে বর্শায় গেঁথে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

নাচ আরম্ভ হলে কালালা ইলুঙ্গা সেই গর্তের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু যারা ঢাক বাজাচ্ছিল তারা ঢাকের সংকেতে তাকে জানিয়ে দেয় যে, সামনে বিপদ। সংকেত বুঝতে পেরে কালালা ইলুঙ্গা তার নিজের বর্শা ছুঁড়ে দিয়ে গর্তটি বের করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে নিজের ঘরে ছুটে যায় পিতার সেই তীরটি পাবার জন্য। সেই তীর নিয়ে সে পূর্বদেশে পালিয়ে যায়। ন্‌কোঙ্গোলো তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়। ভয় পেয়ে ন্‌কোঙ্গোলো একটি গুহাতে বোনদের নিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু তার বোনেরা কালালা ইলুঙ্গা ফিরে এলে তাকে খবর দেয়। ন্‌কোঙ্গোলো ধরা পড়ে। তার শিরোচ্ছেদ হয়। যেখানে তার মাথা পড়েছিল পরদিন সকালে সেখানে লালপিঁপড়ের একটি ঢিবি দেখা যায়। কালালা ইলুঙ্গা নতুন রাজা হন। ন্‌কোঙ্গোলো হন রাজ্যের অধিরক্ষা পূর্বপুরুষরূপী শক্তি।

বালুবারা ন্‌কোঙ্গোলোকে রামধনু বলেও মনে করে। এদের ধারণা, দুটি বড় বড় সাপ দুটি হ্রদে বাস করে। কখনও কখনও উঠে এসে তারা আকাশে পরস্পরের মুখোমুখী হয়। এর ফলে রামধনুর সৃষ্টি হয়। ফলে ন্‌কোঙ্গোলো বালুবাদের কাছে এক প্রাচীন রাজা, রাজ্যের অধিরক্ষক পূর্বপুরুষরূপী শক্তি, রামধনু ও প্রকৃত শক্তি। বালুবার লোকেরা এইজন্য কখনও কখনও নিজেদের ন্‌কোঙ্গোলোর পুত্র বলে বর্ণনা করে। তবে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তারা বেশি মূল্য দেয় ম্‌বিডি কিলুবেকে যে পূর্বদেশ থেকে তাদের রাজ্যে এসেছিল।

ন্‌কোঙ্গোলো গল্পের দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, উচ্চতর প্রাণীরা রাজা বা গোষ্ঠী

প্রধানদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। রাজারা হলেন গোষ্ঠী সমাজের সামগ্রিকতার প্রতীক। গৌরবময় অতীতের সঙ্গে এরাই হলেন যোগাযোগের মাধ্যম। কখনও কখনও তারা পার্থিব শাসকের ভূমিকা পালন করা অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাটাকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

বালুবাদের বিশ্বাস, রাজার দেহ হবে নিখুঁত। তিনি হবেন বলিষ্ঠ। তাকে রুগ্ণ হলে চলবে না। এর কারণ, সমগ্র সমাজের তিনিই হলেন প্রতিনিধি। এইজন্য আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় নিয়ম আছে, কোন রাজা যদি বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকেন, তাঁকে হত্যা করা হয়।

বালুবাদের যখন নতুন রাজা করা হয় তখন তাদের বীরত্বপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীর অভিনয় হয়ে থাকে। নতুন রাজাকে সহবাস ঘরে নিকট কোন আত্মীয়ার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে হয়। তারপর বাইরে এসে কালালা ইলুঙ্গার বিজয় নৃত্যের অভিনয় করতে হয়। এইভাবে তিনি ন্‌কোঙ্গোলোর ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন।

দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার সব গোষ্ঠীরই যে কেন্দ্রীভূত সরকার আছে তা নয়। প্রশাসনের বৃহত্তম একক হয় তো একটি গ্রাম। কোন গোষ্ঠীপ্রধান দ্বারা শাসিত না হয়ে এরা গোষ্ঠীর প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন গোষ্ঠীপ্রধান রাজা থাকলেও খেয়ালখুশি মত তিনি শাসন করতে পারেন না। সামাজিক রীতি ও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে তাঁকে শাসন করতে হয়।

আফ্রিকার অধ্যাত্মজীবন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সমন্বয় রক্ষা করে চলে। কখনও কখনও যে এই দুই যুগের সেতু বন্ধনে ছেদ না ঘটে তা নয়। ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মা সমাজের কল্যাণ না করে ক্ষতিই করে। অনেক লোকও সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।

কিছু কিছু লোক আছে যারা নিজেরাই জানে না যে তারা সমাজের কত ক্ষতি করছে। এরা হল তুক্‌তাক্ করার লোক। আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদের জাদুকরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারাও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এরা আফ্রিকান সমাজের চোখে উল্টো ধরনের মানুষ। অনেকের ধারণা, এইসব লোক অনেক সময় হেটমুণ্ড হয়ে চলাফেরা করে। আফ্রিকার কালো অধিবাসীদের মধ্যে এরা গৌরবর্ণও হতে পারে। নিশাচর পেঁচা বা হায়েনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বেশি। লোকের এরা ক্ষতি করে। স্বাভাবিক লোক সমাজের উন্নতি করে। এরা করে ঠিক তার বিপরীত কাজ।

বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো মৃত্যু হলে আফ্রিকার উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা একে অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করে। কারো তুকতাকের ফলে বা মারণ জাদুর ফলে এমন হয়েছে এরূপ ধারণা করে। কিন্তু গুটিরোগে আক্রান্ত হয়ে বা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হলে তাকে ঈশ্বরের হাতে মৃত্যু বলে গণ্য করে [আমাদের দেশে এখনও নিচুশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গুটিরোগকে শীতলা মায়ের দয়া বলে মনে করা হয়]। তবে অধিকাংশ মৃত্যুর জন্য এরা জাদুকর, গুণিন বা ডাইনী জাতীয় লোকেদের দায়ী মনে করে। দুষ্ট ও অতৃপ্ত আত্মারা ক্ষতির জন্যই ক্ষতি করে কিন্তু শুভ আত্মারা সমাজকে বিপদে ফেলে এইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, পূর্ব পুরুষদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হচ্ছে না বা সামাজিক রীতিনীতি ভঙ্গ করা হচ্ছে।

রোগ, মহামারী বা অন্যান্য বিপর্যয় দেখা দিলে তা কেন হয়েছে, সে কথা জানার জন্য আফ্রিকার উপজাতিরা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে গণৎকারের কাছে যায়। দুধরনের গণনার ব্যবস্থা আছে, যেমন প্রথমত দ্রব্য গণনা, অর্থাৎ দ্রব্যদ্বারা গণনা। এবং দ্বিতীয়ত লোকমুখে প্রেতাত্মার বাণী।

দ্রব্য গণনার অদ্ভুত উপায় আছে। কোন ঝুড়িতে লাল জিনিস বোঝাই করে ঝুড়ি ঝাঁকানো হয়। এর উপরে যে দ্রব্যটি ওঠে তা দেখে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নেওয়া হয় বা কি ঘটেছে তা জানা যায়। এছাড়া চারটি হাড়কেও পাশার মত ব্যবহার করা হয়। এই হাড় চারটি একজন বৃদ্ধ ও তরুণ এবং আর একজন বৃদ্ধা ও যুবতীর প্রতীক হিসেবে কাজ করে। কোন্ হাড় কিভাবে পড়েছে তা দেখে শুভ কি অশুভ গণনা করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রেতাত্মা কোন মানুষকে ভর করে প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেয়।

এছাড়া প্রাচীন গ্রীকদের মত ভবিষ্যৎ গণনার ব্যবস্থাও আছে। এখানে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অলৌকিক আত্মা থাকে বলে বিশ্বাস [যেমন গ্রীসে ডেল্‌ফি]। সাধারণত কোন গুহা বা জলাশয় এই ভবিষ্যৎ বাণীর স্থান হিসেবে কাজ করে। এখানে কোন ব্যক্তিকে ভর করে [গ্রীসের মিনাডের মত] এই অলৌকিক শক্তি জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের জবাব দেয়। [ভারতবর্ষে এই ভরের ব্যবস্থা অদ্যাবধি নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে চালু আছে। তাছাড়া এক ধরনের কাপালিক আছেন যারা এক মন্ত্রপূত জলে জিজ্ঞাসুকে প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী প্রতিফলিত চিত্র দেখতে বলেন। প্রার্থী যার সম্পর্কে জানতে চায় তার কর্মপদ্ধতির চিত্র সেখানে দেখতে পায়।

অনেকে হাতের নখের মধ্যে এই চিত্র বা ছায়া দেখিয়ে থাকে। এ-সব সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে পড়ে না বটে, তবে এর মধ্যে একটি রহস্য যে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই]।

গণৎকারের কথা অনুযায়ী রোগ শোকের কারণ জানা গেলে তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। বান্টু ভাষাভাষী লোকেরা চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করে তাকে বলে বোয়াঙ্গা (Bwanga)। চিকিৎসার জন্য এ ক্ষেত্রে হয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, নয়তো কোন ক্রিয়া করা হয়। হাত পা ভাঙলে সেখানে হয়তো পাতলা কাঠের টুকরো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। তবে এ হল প্রাথমিক চিকিৎসা, গণৎকার নির্দেশিত কারণের যথাযথ চিকিৎসা নয়। যথার্থ চিকিৎসার জন্য সামাজিক ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্য ফিরিয়ে আনাই বিধান।

যারা বোয়াঙ্গা করে সেই চিকিৎসকেরা ন্‌গঙ্গা (nganga) নামে পরিচিত। এরা আসলে গুণিন বা বদ্যি। তবে এই ন্‌গঙ্গারা অনেক সময় উপকার করার চাইতে ক্ষতিই বেশি করে।

অনেক আফ্রিকাবাসী নিরাময়ের জন্য কোন গুহ্য দলকে ব্যবহার করে। এই গুহ্য দলগুলিকেও বালুবারা বোয়াঙ্গা বলে। এই গুহ্য দলের সদস্যরা এমন এক নৃত্য করে যার দ্বারা বিঘ্নিত সামাজিক সাম্য ফিরে আসে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। ফলে অশুভ শক্তি দূরে থাকে।[৫৮]

আফ্রিকানদের এসব পদ্ধতি বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসা স্বাভাবিক যে, তাদের আনন্দ, নিরাময়, রাজনীতি ও ধর্ম সবই এক বৃত্তে যুক্ত।

অধিকাংশ আফ্রিকান উপজাতি নানা শক্তির (সূক্ষ্ম প্রাণীর) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে সর্বোত্তম শক্তি সম্পর্কেও তাদের অবজ্ঞা নেই। এই সর্বোত্তম শক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেছে বলে তারা বিশ্বাস করে।

বালুবারা উন্নত প্রাণীকে বলে ববিদ্যে (Vabidye)। সর্বোত্তম দেবতাকে বলে বিদ্যে-মুকুলু (Vidye-mukulu)। ববিদ্যেরা এই বিদ্যে-মুকুলুর সেবা করে। কখনও তাঁর সঙ্গে সম্মানের ভাগও পায়। কিন্তু কোনরকমেই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

বালুবাদের অনুরূপ বিশ্বাস সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ও মধ্য আফ্রিকাতে প্রচলিত আছে। এখানে সর্বোত্তম ঈশ্বর সম্পর্কে এক এক গোষ্ঠী এক এক শব্দ ব্যবহার করে থাকে যেমন, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে একে বলে ন্‌জাম্বে (Nzambe) দক্ষিণ আফ্রিকায় মধ্যভাগে তাঁকে বলে লেজা (Leza)। শোনারা বলে মোয়ারি (Mwari)।

'সোথো জানা'রা (Sotho Tswana) বলে মোদিমো (Modimo) এবং জুলুরা বলে টিক্সো (Tixo)। পূর্ব উপকূলের লোকেরা বলে মুলুঙ্গা (Mulunga)। কেনিয়ার বাণ্টু ও নিলোটিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা বলে নাগি (Nagi)। নিলোটিক ভাষী অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা বলে জোক (jok) ইত্যাদি। এইসব নামের কোনটা দ্বারা বোঝায় অলৌকিক শক্তি, কোনটা দ্বারা আকাশ ইত্যাদি।

দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার লোকেদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মহান দেবতা সৃষ্টি করেছেন। জগতের তিনিই উৎস। তাঁর পরেই আছে নিম্ন পর্যায়ের নানা শক্তি। [তন্ত্রের নিগুর্ণ পুরুষের পর স্রষ্টা ঈশ্বর থেকে নানা দেবদেবীর মত]। অনেক সমাজে সরাসরি 'পুরুষোত্তম' এই দেবতার পূজাবিধি নেই। নেই তার কারণ, এই সর্বোত্তম শক্তিকে তারা গুণগত দিক থেকে মানুষের চাইতে এত পৃথক বলে মনে করে যে, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবার কলাকৌশল তাদের অজ্ঞাত। আবার এও হতে পারে যে, যেহেতু সর্বত্রই তিনি বিরাজমান তাঁকে আলাদা করে ডাকার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন কোন গোষ্ঠী সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লে তবেই তাকে ডাকে, যেমন অনাবৃষ্টি ও মহামারী। কেউ কেউ আবার সব সময়ই তাঁর পুজো করে থাকে।

এই সর্বোত্তম দেবতাই মানুষ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তি ও মানুষ সকলেরই উৎস। জীবিত বা মৃত সকলেই তাঁর উপরই নির্ভর করে।

(১০) **জুলুদের ধর্ম বা অধ্যাত্ম সাধনা :** আধুনিক নানা বিষয় চর্চাতে জানা গেছে যে, আফ্রিকার ধর্মীয় বিশ্বাস আদিম বিশ্বাস নয়। এদের ধর্ম যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বা অর্থহীন তাও নয়। তাদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, অনুষ্ঠান ও জীবন-দর্শনের পেছনে যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ কাজ করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের অধিবাসী জুলুরা বাণ্টু ভাষাভাষী ন্‌গুনি (Nguni) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এরা প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা-ধারার সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে [এই সমন্বয়ী মনোভাব ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের গ্রহণযোগ্য ধারাগুলি আত্মসাৎ করে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বিস্তৃত ও উদার করে তুলেছেন]।

একশ বছর আগেও জুলুরা উর্ধ্ব আকাশের কোন দেবতা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতো না। তারা বরং জগৎ ও সৃষ্টি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল। তবে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারের মুখে আত্মরক্ষার জন্য তারা শেষ পর্যন্ত উর্ধ্ব আকাশের দেবতার

রূপ কল্পনা করে তাঁর নাম দিয়েছে ইনকোসি যেজুলু (Inkosi yezulu)। এই এই ইনকোসি যেজুলু হলেন নিত্য পুরুষ। তাঁর থেকেই শক্তির উৎপত্তি [তন্ত্রের নির্গুণ পুরুষ থেকে যেমন স্বভাবে শক্তির উদ্ভব]।

এই ইনকোসি যেজুলু বা আকাশদেবতা ভাল এবং মন্দ উভয়েরই উৎস [ভারতের অঘোরপন্থী তান্ত্রিকেরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, চন্দন ও বিষ্ঠা সমান। উপনিষদকারেরাও সর্বভূতে এই পরমাত্মাকে লক্ষ্য করেছেন।] ইনকোসি যেজুলু দয়ালু ও উদার। তবে কখনও কখনও তাঁর মর্জি বোধের অতীত। অনাবৃষ্টি সন্তানহীনতা ইত্যাদি নানা সমস্যায় জুলুরা এঁর স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। অনবরত এই সর্বোত্তম দেবতার বর্ণ পরিবর্তন হয় [তন্ত্রে সৃষ্টির অবতরণ পর্যায়ে নানা বর্ণ দেখা দিয়েছিল। এই বর্ণের সংখ্যা ৫১টি।] এঁর পঞ্চপদ [বিষ্ণুর ত্রিপদ যেমন দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক ও ভূ-লোক-এর প্রতীক। এর পঞ্চপদ কি তেমনই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক ?] তিনি সর্বদৃষ্টি-সম্পন্ন বা সর্বদ্রষ্টা। এমন যে মহান শক্তি, তিনি গিরগিটির মত এত নিকৃষ্ট প্রাণী কি করে তৈরি করতে পারেন, জুলুদের কাছে সেটাই প্রশ্ন। এই জন্য এঁর প্রতি তাদের তেমন শ্রদ্ধা নেই।

এই আকাশদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো সম্ভব হলেও এঁকে এড়িয়ে চলাকেই জুলুরা বিধেয় মনে করেছে। কারণ, তাঁর অনন্ত ব্যাপ্তি অনুমান করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জুলুরা এই আকাশদেবতার পুজো করে না। এঁর পুজোর জন্য তাদের দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি চলে। জুলুদের দেশের কয়েকটি পাহাড় এই আকাশদেবতার নামে নির্দিষ্ট আছে [আমাদের যেমন হিমালয় হচ্ছে দেবভূমি]। এই সব পাহাড়ে পশুচারণা করা হয় না। মানুষও কদাচিৎ এখানে পদার্পণ করে।

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে জুলুরা এই পাহাড়গুলিতে আরোহণ করে। এ জন্য দীর্ঘ উপবাস ও প্রার্থনার প্রয়োজন আছে [হিমালয়ে যেমন ভারতীয় সাধকেরা কৃচ্ছ্র-সাধন করে সাধনা করেন]। জুলুগোষ্ঠীর সকলেই এই আকাশদেবতার পূজার জন্য তৈরি হলে নির্দিষ্ট দিনে পাহাড়ের পাদদেশে সবাই গিয়ে উপস্থিত হয়। সবাই তখন মৌন অবলম্বন করে। তারপর খুব নীরবে, শ্রদ্ধাসহকারে পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়। বৃষ্টি সম্পর্কিত গুণিন তারপর বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা শুরু করেন [ভারতীয় যোগীরা তাঁদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বৃষ্টি নামাতে বা বন্ধ করতে পারতেন। তার প্রমাণ দিয়েছিলেন তারাপীঠের বামাক্ষেপা মাতৃশ্রাদ্ধে ভোজের আসরে গণ্ডীবদ্ধ করে

বৃষ্টিকে আটকে রেখে]। প্রার্থনার সময় জুলুরা হাঁটু গেড়ে বসে বা ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে আকাশদেবতাকে সম্মান জ্ঞাপন করে। প্রার্থনা শেষ হ'লে সবাই নীরবে ফিরে আসে।

জুলুদের চোখে সূক্ষ্ম জগতের বিরাট মূল্য। ঈশ্বরের ছায়া হিসেবে এখানে উন্নত শক্তি বা জীবাত্মারা বিচরণ করে। বিপদের সময় উত্তর পুরুষদের জন্য তারা এই আকাশ-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। এই শক্তিগুলি গণকদের কথা সব সময় মনে রাখে। এদের সংস্পর্শে এলে মাথা ঠিক রাখা দায়। এ জন্য ওষুধ বা গাছগাছড়ার শিকড় ব্যবহার করে বলে গণৎকারেরা বা গুণিনরা উপদেবতা বা অপদেবতাদের সংস্পর্শে এসেও পাগল হয়ে যায় না। সাধারণ মানুষ এদের সংস্পর্শে এলে পাগল হয়ে যেত। এই উপদেবতা বা অপদেবতারা যাদের উপর ভর করে তাদের পরিবর্তন ঘটে যায়। ঠিক যেমন পাখি ডিমে তা দিলে ডিম ফেটে পাখির ছানা বেরয় তেমনি। এর আর একটি সুন্দর উদাহরণও জুলুরা দেয়। যেমন, কুমারী মেয়ে। এরা উপদেবতা বা অপদেবতার ছোঁয়া পেয়ে হয় বিবাহিতা রমণী। এরপর নতুন ছোঁয়ায় হয় সন্তানের জননী।

জুলু গুণিনরা সব জিনিসকে উল্টোভাবে দেখে। ছায়া জগতে অন্ধকার হ'ল আলোর প্রতীক, এবং আলো হ'ল অন্ধকারের প্রতীক। উপ বা অপদেবতারা সেখানে তেতো জিনিস পছন্দ করে। কারণ সেই উল্টো জগতে তেতোই হ'ল মিষ্টি। [এর একটা গভীরতর অর্থ থাকাও সম্ভব। স্থূল মিষ্টির সূক্ষ্ম অবস্থাও তেতো এবং স্থূল তেতোর সূক্ষ্ম অবস্থা মিষ্টি হতে পারে। কারণ যা তেতো, তাই মূলত মিষ্টি। মূলে তেতো আর মিষ্টিতে কোন ভেদ নেই।] মানুষ দিনে কাজ করে বলে, উপ বা অপদেবতারা কাজ করে রাতে। মানুষের ডান হাত তাদের বাঁ হাত [এই আশ্চর্য দৃশ্য সম্ভবত ভারতীয় যোগীরাও দর্শন করে থাকেন। যখন যোগ বলে স্বচ্ছ আত্ম-পর্যায়ে তারা প্রবেশ করেন তখন দর্পণে প্রতিফলিত নিজের আকৃতির প্রতিমূর্তি তারা দেখে থাকেন। এই প্রতিমূর্তির বাঁ হাত সাধারণতই আমাদের ডান হাতের প্রতিফলন। পদার্থবিদ্যার অ্যান্টিম্যাটারের কল্পনাও অনুরূপ। particle-এর Antiparticle-এ একই ধরনের mass ও spin আছে। তবে electrical charge ও magnetic movement সম্পূর্ণ উল্টো]। তাঁদের এই উল্টো ব্যবহারের জন্য গণৎকার বা গুণিনরা বাঁ হাতে ক্রিয়া করে থাকে। [সূক্ষ্ম স্তরের এই উল্টো অবস্থার জন্যই কি শক্তির দ্রুত সান্নিধ্য লাভের আশায় ভারতীয়দের হেঁট মুণ্ড হয়ে সাধনার ব্যবস্থা ছিল ? কারণ, এটা সত্য যে, হেঁট মুণ্ড হয়ে সাধনা

করলে দ্রুত জ্যোতি দর্শন হয়]। জুলুদের পরলোক বা অতীন্দ্রিয়-লোক সম্পর্কে ধারণা পৃথিবীকে সমতল বলে ভাবার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য জুলুরাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী গোলাকৃতি।

অনেক জুলু বিশ্বাস করে যে, পিঠের মত পৃথিবীর উঁচু স্থানে অর্থাৎ বুকে তারা বাস করে। ফলে যারা উল্টো পিঠে বাস করে তারা উল্টো ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া পৃথিবীর এপিঠে দিন হলে ওপিঠে রাত হয়। অর্থাৎ উল্টো জগৎ বা উপ বা অপদেবতার জগতে সবই উল্টো। [এ ধরনের ব্যাখ্যা হয়তো পরবর্তী কালে ভারতে পুরাণ বর্ণনার মত বোধের অভাবে অপব্যাখ্যা মাত্র। যথার্থ সত্য তাদের কাছ থেকে এখন অন্তর্হিত]। সেই জন্য জুলুরা মৃত ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা কবর দেয় যাতে সে দিনের বেলা অপর জগৎ বা পরলোকে গিয়ে পৌছুতে পারে।

আফ্রিকানদের ধর্ম আলোচনা করলে একটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ধর্ম প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, এবং মাতৃভূমির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত (এই বোধ ভারতেও আছে, এইজন্য বলা হয়েছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী')। অতীন্দ্রিয় শক্তির কাছে যে মানুষ অতি হীনবল আফ্রিকানদের ধর্মচর্চা করলে তাদের এই বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। (এই ধরনের বোধ ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও ভারতীয় অধ্যাত্ম তত্ত্বে এর কোন স্থান নেই। মানুষকে এইজন্য তারা দুর্বল তো দূরস্থান—'অমৃতস্যপুত্রাঃ' বলে আহ্বান জানিয়েছেন। তন্ত্র বলেছে 'শিবোহম' 'সোহহং'। উপনিষদে আছে 'তৎ ত্বম অসি,' অর্থাৎ তুমিই সেই। মানুষকে অসহায় বলে কখনও ভাবা হয় নি।) আফ্রিকানরা সার্থক জীবনযাপনের জন্য উপ বা অপদেবতার সাহায্য প্রয়োজন আছে বলে মনে করে। (ভারতীয়রা এজন্য কর্মফলকেই মূলত দায়ী করে।) আফ্রিকার আদিবাসীরা আরও বিশ্বাস করে যে, জগতে মানুষ একা নয়। উপ বা অপদেবতারাও তাদের সঙ্গে আছেন। ইহলোকের বাইরে পরলোক আছে। জীবন সেখানে শুদ্ধ হয় ও রূপান্তর লাভ করে। সব আদি ধর্মেই এ ধরনের বিশ্বাস না থাকলেও আফ্রিকার অনেক ধর্মেই এরকম বিশ্বাস আছে।

সংক্ষিপ্ত আকারে আফ্রিকার আদিবাসীদের অধ্যাত্ম চেতনার মূল কথা এই যে,

(১) তারা নানা দেবতায় বা শক্তিতে বিশ্বাস করে।

(২) তাদের ঐতিহাসিক কোন প্রত্যাদেশ (revelation) নেই।

(৩) এরা বলিদান ও আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস করে।

(৪) ধর্মের সঙ্গে তুকতাক্ বা জাদু ক্রিয়া এখানে একাত্মভাবে যুক্ত।

(৫) একই মহাজাগতিক নিয়মের মধ্যে দেবতা বা মানুষ সবাই বিধৃত। এঁরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। [এ ক্ষেত্রে ভারতীয় তন্ত্রে গোলকরূপ (অণ্ডাকৃতি) জগৎ সম্পর্কিত ধারণা ও দেবদেবী ও মানুষ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে এদের ধারণার মিল আছে।]

(১১) **উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের ধর্ম**: এক সময় বস্তুবাদ ভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীর সব আদিবাসীদেরই চমকে দিয়েছিল। তারা নিজেদের অধ্যাত্ম সাধনা ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইউরোপীয়দের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবার সবার মধ্যেই নিজেদের অতীতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে। প্রত্যেকেই নিজেদের অতীত ধর্ম-বিশ্বাসে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। বস্তুত ইউরোপীয় সভ্যতা বা ধর্মগ্রন্থভিত্তিক অধ্যাত্মতা অপেক্ষা অলিখিত সরল চিন্তা ও অধ্যাত্ম বিশ্বাসই বেশি মূল্যবান। অধ্যাত্ম সত্য, জীবাত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদিতে তাদের বিশ্বাস অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে হয়েছিল। কোন একটি নির্দিষ্ট মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করে এরা এগুবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছে। ভারতবর্ষের লিখিত ধর্মগ্রন্থে নানা তর্ক বা logic দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাগার্য সাধনায় তর্ক-বিতর্কের কোন স্থান নেই। অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে। ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনাও সেই পর্যায়ের, বরং তন্ত্রসাধনা যখন আর্যগণ কর্তৃক লিখিতরূপ ধারণ করেছে, তখন শুধুমাত্র তত্ত্বভিত্তিক হয়েছে, সত্য-ভিত্তিক হয় নি। তন্ত্র তত্ত্বের জিনিস নয়, চর্চার জিনিস। যোগভিত্তিক তন্ত্র দ্বারা সরাসরি অতীন্দ্রিয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। তত্ত্ব দ্বারা যে এর অনুমান হয় না, সিন্ধু সভ্যতার ইঙ্গিতময় প্রতীকগুলি আলোচনা করলেই তা প্রমাণ হবে। যথা সময়ে সেই সিন্ধুসভ্যতার কথাও আমরা আলোচনা করব। এই সিন্ধুসভ্যতাতে যোগ ও তন্ত্র অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। যোগের উদ্ভব আর্যদের মধ্যে হয় নি প্রাগার্য ভারতীয়দের মধ্যেই হয়েছিল। ভারত মৃত্তিকার গুণের মধ্যেই এই অধ্যাত্মতার সূত্র জড়িত ছিল। পতঞ্জলি যোগসূত্রের উদ্ভাবক নন— তত্ত্ব সংগ্রাহক মাত্র। উত্তর আমেরিকায় আদিবাসীদের মধ্যেও ভারতের প্রাগার্য সাধনার মত নিজস্ব সাধনার ধারা ছিল। তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা এখন মনে করছে যে, যথার্থ জ্ঞান ছিল তাদের

প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই। তাদের অধ্যাত্ম অনুষ্ঠান এইরকম বাক্য দিয়ে আরম্ভ, যেমন, 'কথিত আছে…'। এর দ্বারা তারা তাদের প্রাচীন মনীষীদের জ্ঞানের কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। এই মনীষীরা অতীন্দ্রিয়কে সরাসরি নিজেদের মধ্যে অনুভব করেছিলেন বলে বিশ্বাস।

আমেরিকার আদিবাসীরা মনে করে যে, তাদের সকলের জীবন এক মহান সত্যের মধ্যে বিধৃত। অতীন্দ্রিয় পবিত্র সত্তা যথার্থই আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সময়ে তার প্রকাশ ঘটে। ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মত ও অনুষ্ঠানের মত এ হল স্থান-মাহাত্ম্য ও সময়মাহাত্ম্যের ব্যাপার। সমস্ত প্রাণই পবিত্র। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই সেই পরম সত্তা রয়েছে। (ভারতীয় তন্ত্র তত্ত্বও অনুরূপ বিশ্বাসে উজ্জীবিত)। জীবনের সমগ্র পরিধিই অতীন্দ্রিয় সত্তা দ্বারা প্রভাবিত।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা এক পরম সত্তায় বিশ্বাস করত (ভারতের আত্মন, ব্রহ্মণ, নির্গুণ পুরুষ প্রভৃতির মত)। তাদের চিন্তাধারা একটি বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রকৃতির মধ্যেও এই বৃত্ত তারা লক্ষ্য করেছে। এ সিদ্ধান্তে তারা এসেছে চন্দ্র সূর্যের গোলাকৃতি ও ঋতুর নির্দিষ্ট পরিক্রমা ইত্যাদি লক্ষ্য করে। (ভারতীয় তন্ত্র এই জন্য জাগতিক সমস্ত ঘটনাকে বৃত্তাকার বলে মনে করে। যে শক্তি তাকে এই বৃত্তাকারে ধরে রেখেছে, তার নাম দিয়েছেন তাঁরা বৃত্তকা শক্তি। তাঁকেই ৺কালী বলা হয়। তবে যথার্থ অর্থে তাদের এই বৃত্ত হল অণ্ডাকৃতি মাত্র। আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিগব্যাঙ্ (Big Bang) তত্ত্বও সেই সত্যকে প্রমাণ করছে।) জীবজগতের চালচলনের মধ্যেও এই বৃত্তাকার পরিক্রমা আমেরিকার আদিবাসীরা লক্ষ্য করেছে। তাদের মতে প্রত্যেকটি জিনিসই বিচার করে দেখতে গেলে গোলকাকারে ঘোরাফেরা করে। (মহাবিশ্বজগৎ সম্পর্কে আইনস্টাইনও শেষ পর্যন্ত এই 'গোলক' ভাবকেই সত্য বলে স্থান দিয়েছেন। ভারতীয়রা এইজন্যই জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড বলে কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ জগৎ ডিমের ন্যায় গোলাকার।)

আমেরিকানদের এই যে বৃত্ত বা গোলক কল্পনা তার মূল হল তার কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকেই সৃষ্টি বা এই কেন্দ্রই হল সৃষ্টির উৎস।[৫৯] (ভারতীয় তন্ত্রমতেও শূন্যে সুপ্তশক্তির স্বভাবে নির্গুণে যে আলোড়ন হয় তা বিস্ফোরণের আকারে গোলক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যে কেন্দ্র থেকে তার উৎপত্তি, বিস্ফোরণের পর তা নির্গুণ আকারে বিরাজ করে। এই নির্গুণই হল ৺কালীর পায়ের নিচের শিব। নির্গুণ থেকে উদ্ভূত হয়ে

নির্গুণের মধ্যেই তা নৃত্যপর়া। পরিণতিতে আবার নির্গুণেই তা লয়প্রাপ্ত হয়। একেই বলে ভারতীয় শাস্ত্রে প্রলয়.)। আমেরিকার আদিবাসীরা এই কেন্দ্রভিত্তিক গোলক-সত্যকে অনুসরণ করেই তাদের যত কিছু ধর্ম, শিল্প, সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতির প্রচলন করেছে। এইজন্যই তারা অগ্নির চারদিকে বৃত্তাকারে নৃত্য করে (যেন অগ্নি হল ভারতের তন্ত্রোক্ত বিন্দু যার চতুর্দিকে গোলকধাম বা জগতের উৎপত্তি হয়েছে)। এই কেন্দ্র অগ্নি, পবিত্র বাদ্যযন্ত্র (ঢাক) বা দণ্ড, বাঁশী ইত্যাদিও হতে পারে।

আমেরিকার আদিবাসীরা প্রকৃতি এবং জীবনে দ্বৈতে বিশ্বাস করে। একই গোলকে যুক্তভাবে দ্বৈত আকারে তারা যুক্ত থাকে বলে বিশ্বাস[৬০] (যেমন, ভারতীয় তন্ত্রে এক নির্গুণের মধ্যেই শক্তি সুপ্ত থাকে। উপনিষদে যাকে চণক-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চণক বা ছোলা একটি আচ্ছাদনে আবরিত থাকলেও মূলত বীজাকারে দুই। তারা বিভক্ত হয়েই গুণরূপ উদ্ভিদ তৈরি করে। এই উদ্ভিদ-কালই জগতের কাল। পরিণতিতে সেই চণক।) আমেরিকার আদিবাসীরা লক্ষ্য করে দেখেছে যে, দুই ছাড়া কিছু নেই। প্রকৃতির মধ্যেও এই দ্বৈতসত্তার ইঙ্গিত বর্তমান। যেমন, আলো থাকলেই অন্ধকার আছে, গ্রীষ্ম থাকলেই শীত, পুরুষ থাকলেই আছে স্ত্রীলোক এবং ভাল থাকলেই মন্দ। এই 'দুই' যে পরস্পর পরস্পরেরর বিরোধী তা নয়, বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই দ্বৈতবাদ আমেরিকানদের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও রয়েছে। মাতা পৃথিবীর দুই সন্তান নিয়ে তাদের পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের আদিবাসীদের অভিজ্ঞানে এরা স্থান লাভ করেছে কোয়াকিউট্‌লের সিসুট্‌ল (Kwakiutl's Sisutl) হিসেবে। এই সিসুট্‌ল হল দ্বিমস্তকযুক্ত সর্প। একটিতে সে শাস্তি দেয়, আর একটিতে রক্ষা করে। বাজপাখির মধ্যেও তারা এই প্রতীক লক্ষ্য করেছে। এই পাখি ভয়ও দেখায়, যত্নও নেয়। সূর্যনৃত্যে তারা যে দণ্ড ব্যবহার করে তাও দ্বিমুখ।

কিন্তু এই 'দুই' ভারতীয় সাংখ্যের মত পৃথক পুরুষ ও প্রকৃতি নয়। এই 'দুই' একেরই দুই হিসেবে প্রকাশ [ভারতীয় তন্ত্রের হং ও স-এর মত। যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। তারা পৃথক বলে প্রতীয়মান হলেও একই ছন্দের মধ্যে ধৃত। এই 'এক'ই দ্বৈত অবস্থা মেরুবাসী ইনুইৎদের (Inuit-এর) মধ্যে তারা দেখতে পেয়েছে। মেরু-শীতে ইউরোপীয় শ্বেতকায়রা যখন সর্ব প্রকারে প্রস্তুত হয়ে যায়, ইনুইৎরা থাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। এরা পারিপার্শ্বিককে

তাদের শত্রু বলে কল্পনা না করে মিত্র বলে ভাবে। বরফ ও তুষার তাদের শত্রু নয়, বন্ধু।

উত্তর আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কাছে সুস্থ সৌহার্দ্যের প্রতীক হল দেয়া এবং নেয়া। একটি বৃত্তের মধ্যে ত্রিকোণ হল এই সম্পর্কের প্রতীক।[৬১]

আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের সকল কাজে সাফল্যের জন্য সহযোগিতা অনুসন্ধান করে বেড়ায়। যে অনুষ্ঠান দ্বারা এই সহযোগিতা পাওয়া যায় তাদের মতে তার তিনটি দিক আছে। এদের মোহায়োক (Mohawk) গোষ্ঠী অনাবৃষ্টির মুখোমুখি হলে, শস্যহানির মুখোমুখি হলে—বজ্রশক্তির উপর নির্ভর করে (যেমন আর্যরা নির্ভর করতেন দেবতা ইন্দ্রের উপর)। এই শক্তির কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। এরা বৃষ্টির জন্য বৃষ্টি-নৃত্য করে (ভারতের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের নিচুশ্রেণীর লোকেরা যেমন অনাবৃষ্টির সময় বুক চাপড়ে মাটিতে জল ঢেলে গান করে, বা মুসলমানরা গান গায়—'আল্লা ম্যাগ দে, পানি দে।'

বৃষ্টির জন্য মোহায়োকরা মাঠে সমবেত হয়ে ঢাক পিটতে শুরু করে। ঢাকের তালে তালে নাচ শুরু হয়, প্রার্থনা সঙ্গীত গীত হতে থাকে, জল ছিটানো হতে থাকে, অবশেষে অনুষ্ঠান শেষে বৃষ্টি নামে।

আরোগ্য, পথনির্দেশ, শক্তি প্রভৃতি লাভের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা ভিত্তিক অর্থাৎ দেয়া নেয়া ভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বিশ্বজগতের গঠন এবং যে শক্তি এই বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তাঁকে আমেরিকার আদিবাসীরা চারটি গুণের মধ্যে দেখেছে। যেমন, চারদিক, চার ধরনের বায়ু, ঋতু ও রঙ। চারটি উপাদান দিয়ে এই পৃথিবী সৃষ্ট—যেমন মাটি, বায়ু, জল ও আগুন। (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ভারতেও অনুরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এক সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁর নাম অজিত কেশকম্বলিন। তিনি সৃষ্টির উপাদান হিসেবে বিশেষ করে মানবদেহ গঠনে মাটি, জল, আগুন ও বায়ুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন।) এই কারণেই 'চার' সংখ্যা আমেরিকার আদিবাসীদের কাছে খুব পবিত্র। একটি বৃত্তের পরিধির উপর চারিটি কোণ এঁকে এরা এই সত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।[৬১]

এই 'চার'-এর মধ্যে জীবনের যত বৈচিত্র্যকে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা ধরবার চেষ্টা করেছে। বলিদানের নিয়ম অনুসরণ করে এই চারকে 'এক' বৃত্তে ধরে রাখা যায় বলে তারা বিশ্বাস করে। আমেরিকানরা মনে করে যে, একজনের মৃত্যু হয় অপরের জন্মকে সুগম করার জন্য। যেমন পুরনো পাতা ঝরে গেলে

সেখানে নতুন পত্রকোষের উদ্গম হয়। জন্মমৃত্যুর অদ্ভুত এক চক্রে জীবজগৎ পরিচালিত, এইজন্য চক্র হল তাদের প্রতীক (আমাদের বৌদ্ধদের ধর্মচক্র)।

এই 'চার' সংখ্যা ছাড়া 'সাত' সংখ্যারও আমেরিকার আদি অধিবাসীদের কাছে এক বিরাট মূল্য আছে। [এই 'সাত' গুহ্যবিদ্যাসাধকদের কাছেও মূল্যবান। এই জন্য সপ্ততল-এর কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুদের বিবাহও হয় সাত পাকে।] এই জন্য আমেরিকানদের সাতটি অনুষ্ঠান, সাতটি ভবিষ্যৎবাণী ও পশ্চিম দিকে [অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে] অগ্রসর হবার জন্য সাতটি নির্দিষ্ট স্থান আছে [তন্ত্রের দেহমধ্যস্থ ষটচক্র, ষটচক্র ভেদ হলে ঈশ্বরীয় পর্যায় ও সবশেষে মোক্ষ]। সাত-এর একটি অনন্ত বৃত্তে তারা বিশ্বাস করে, যেমন সাত বছর, ৭ × ৭ = ৪৯ বছর [আমাদের 'নয়'। ৯ × ২ = ১৮ অধ্যায়। এইভাবে ১০৮ নাম] ইত্যাদি। এদের এই জন্য সাতজন পিতামহ আছেন [আমাদের সপ্তঋষি, যারা গোত্র প্রধান]।

আমেরিকানদের ওজিবুয়া (Ojibwa) পুরাণ কাহিনীতে সাতজন পিতামহ পুরুষের উল্লেখ দেখা যায়। আমেরিকানদের অনুষ্ঠান যন্ত্রে এই সাতকে চিত্রাঙ্কন করে দেখানো হয়। এই যন্ত্রটি তিনটি সরল দণ্ডকে একটি কেন্দ্র স্থির করে আড়াআড়িভাবে বসানো হয়।[৬৩] এতে যে ছয়টি মুখের সৃষ্টি হয়, তা দ্বারা চারটি দিককে এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ এই দুটি শক্তিকে বোঝাবার চেষ্টা চলে। যেখানে এই দণ্ডগুলি পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে গেছে সেখানে রয়েছে সপ্তম অবস্থা। এই কেন্দ্র হল বিন্দুস্বরূপ সেখানে শক্তি আত্মস্থ অবস্থায় আছে, বা যেখান থেকে চতুর্দিকে সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য এজন্য যে আমেরিকানরা মনে করে যে, আমিই সব কিছুর কেন্দ্র [তন্ত্রে যেমন বলা হয় শিবোহম, সোহহং ইত্যাদি] তা নয়। বরং তারা বলতে চায় যে, সব শক্তিই আমার আয়ত্তে আসতে পারে, আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমিও শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারি। দিব্যদৃষ্টিতে, স্বপ্নে, অনুষ্ঠানে এবং অধ্যাত্ম শিক্ষায় এই শক্তিগুলি তাদের কাছে আসে বলে আমেরিকানরা বিশ্বাস করে।

আমেরিকার আদি অধিবাসীরা শেষ প্রতীক তৈরি করেছে একটি বৃত্তকে চার ভাগে ভাগ করে। এটা হল পূর্ণতার প্রতীক।[৬৪] অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমেরিকার এই আদিবাসীরা যখন পবিত্র তৃণ দগ্ধ করে, পান করে, ধূমপান করে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে লক্ষ্য করে তখন বলে, 'আমরা সবাই আত্মীয়।' প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত [পরমাত্মা বিধৃত বলে ভারতীয়রাও সর্বত্র আত্মস্বরূপ দেখতে পায়] আমেরিকানরা এই বিশ্বাসে অনড়। অনুষ্ঠানে অংশ

গ্রহণকারীরা মনে করে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাদের ঘিরে রয়েছে, তার প্রয়োজনে প্রার্থনা অনুযায়ী সাড়া দিচ্ছে। [ভারতীয় কাপালিক সাধকদের পঞ্চ'ম'কার চক্রসাধনার মত]।

(১২) **অ্যানডিস (Andes)-দের ধর্ম-সাধনা** : দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল জুড়ে অ্যানডিয়ান (Andean) উচ্চভূমি রয়েছে। স্থানটি চলে গেছে কলম্বিয়া থেকে চিলির দক্ষিণভাগ পর্যন্ত। উপমহাদেশে এই উচ্চভূমিই হল দীর্ঘতম পার্বত্য অঞ্চল। এই পর্বতশ্রেণীর উপর কমপক্ষে বরফাচ্ছন্ন ৪৫টি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। উচ্চতা কুড়ি হাজার ফিটের মত।

এই পার্বত্য অঞ্চলে ও উপত্যকাতে বহু উপজাতি বাস করে। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানক্রিয়া আছে। নিম্ন পূর্বাঞ্চল থেকে এই পার্বত্য অঞ্চলের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব ঢালু অঞ্চলে নদীগুলি সব আমাজোনের বনাঞ্চলে ঢুকে গেছে ও এ অঞ্চলের আবহাওয়া, এখানকার জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং ধর্মভাবকে প্রভাবিত করেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে সকলেরই ধ্যান ধারণা প্রায় একরকম। এই ধ্যান ধারণাগুলি হল দেবদেবী, শক্তি, প্রাকৃত জগৎ, পবিত্র স্থান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কেও এরা একই ধরনের ধ্যান ধারণা পোষণ করে।

ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেই এখানকার আদিবাসীদের বাস বেশি। এখানেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখানে এখনও প্রায় এক কোটি স্থানীয় অধিবাসী বাস করে। এদের মধ্যে কোয়েচাস (Quechus) গোষ্ঠীর লোকই বেশি। প্রায় দশ লক্ষ আইমারা (Aymara) ভারতীয়ও এখানে বাস করে। এই দুই গোষ্ঠীর ভাষা ভিন্ন হলেও তাদের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অনেক মিল আছে।

অ্যানডিস (Andes)-এর লোকেদের জীবিকা হল কৃষি। তারা চাষবাস করে ও পশু চরায়। পশুর মধ্যে আছে ভেড়া, লামা ও আলপাকা। জীবনযাত্রার জন্য তাদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়। নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য এরা পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করার চেষ্টা করে। সারা বছর ধরেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল ভাল শস্য পাওয়া, গৃহপালিত পশুবংশ বৃদ্ধি করা, বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আরোগ্য লাভ করা।

এদের অনুষ্ঠান একটু জটিল। প্রার্থনা জানানো, অর্ঘ্য দান করা, বলি দেওয়া, পানীয় উৎসর্গ করা সবটাই একটু অদ্ভুত ধরনের। এ-সব তারা করে থাকে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

পার্বত্য জাতিদের পৃথিবী মাতার নাম হল পাচামামা (Pacha mama)। তিনি প্রাণদাত্রী ও জীবন রক্ষাকারিণী। তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে থাকেন আপুগণ (Apus)। এরা এ অঞ্চলের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। পার্বত্য নিচু এলাকা যে-সব শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নাম আউকি (Aukis)। এঁরা আপুদের মত তত ক্ষমতাশালী নন। এই শক্তিগুলির এক এক অঞ্চলে অঞ্চল অনুসারে নাম। এঁরাই হলেন আমেরিকার ভারতীয়দের প্রধান প্রধান দেবতা। বজ্র, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বায়ু, আগুন, ঝর্ণা, পাহাড়, পর্বত সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক এঁরা। এই দেবতারা সবাই প্রাণবন্ত। জীবনীশক্তিও এদের হাতে। সুতরাং এদের খুশি করার জন্য প্রায়ই এঁদের উদ্দেশে নানা জিনিস দান করা হয়।

আপু, আউকি ও পাচামামা—এঁরা সবাই শস্য উৎপাদন, পশুবংশবৃদ্ধি ও সমাজকল্যাণে নিজেদের শক্তি ব্যয় করেন। এরা যদি ক্ষুধার্থ থাকেন, বা কোনভাবে অপমানিত বোধ করেন তাহলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। সুতরাং এদের সব সময় খুশি রাখার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

অ্যানডিসদের কৃষিকর্ম আরম্ভ হয় আগস্ট মাসে। এই সময়ই পৃথিবী মাতা পাচামামা জীবিত হয়ে ওঠেন বলে এখানকার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। এই সময় রজস্বলা পৃথিবী বীজ ধারণের উপযুক্ত হন। ফলে শস্য যাতে ভাল জন্মায় এ-জন্যে নানা অনুষ্ঠান করতে হয়। নানা শস্য, খাদ্যদ্রব্য ও লামার ভ্রূণ পৃথিবী মাতার নামে উৎসর্গ করা হয়। এই সময় পৃথিবী মাতার উদ্দেশে যে প্রার্থনা জানানো হয় তার যথার্থ অর্থ এই : 'হে পৃথিবী মাতঃ—তোমার যা প্রাপ্য তা তোমাকে আমি দিচ্ছি। হে প্রতিপালিকা মাতঃ আমার এই সামান্য দান গ্রহণ কর। মা যেমন তার স্তন দ্বারা আমাদের প্রতিপালন করেন তুমিও তেমনি-ভাবে আমাদের প্রতিপালন করছ। আমার সামান্য দান গ্রহণ করে আমার উপর প্রীত হও। আমার দুঃখ ও রোগশোক দূর কর, যাতে আমি আরও এক বছর বাঁচতে পারি।'

অনুরূপ প্রার্থনা, অগ্নিদগ্ধ ভোজ্যদ্রব্য এবং অনেক ক্ষেত্রে রক্তাক্ত বলি দিয়েও পৃথিবী মাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

অসুখবিসুখ করলে আমেরিকার ভারতীয় অধিবাসীরা পাকো (Paqo) নামে বদ্যিদের কাছে যায়। বদ্যি বুঝবার চেষ্টা করেন কেন এই রোগ হয়েছে। নানা শ্রেণীর পাকো আছেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা ভবিষ্যৎ গণনা করেন, কেউ বা অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন। পাকোদের মধ্যে তিনিই

হলেন শ্রেষ্ঠ, যিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েও বেঁচে আছেন। তাকেই Andes বা আমেরিকার ভারতীয় অধিবাসীরা যথার্থ পুরোহিত বলে মনে করেন ।

দুই

ঈশ্বর সন্ধানে ভারত। ভারতের প্রাগার্য ধর্ম : সিন্ধুসভ্যতায় অধ্যাত্ম সাধনা।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয়দের ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের যথার্থ অধ্যাত্ম সাধনার শুরু করেছিলেন আর্যরা। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কার করার পর এ ধারণা পাল্টে গেছে। আর্যদের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার বাস্তব দিক যেমন উন্নত ছিল, তেমনই ছিল এর অধ্যাত্ম সাধনা।

সিন্ধু উপত্যকার খ্রীষ্ট পূর্ব তিন হাজার বছরের ইতিহাস কোন লেখা থেকে পাওয়া যায়নি। কারণ, তাদের লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদের অধ্যাত্ম চিন্তাধারার পরিচয় তাদের যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে, তাই। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। এই সমস্ত দেবদেবীকে খুশি করার জন্য বলিদান প্রথাও ছিল। প্রকৃতির নানা জিনিসে অন্যান্য আদিবাসীর মত তারাও অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। সেই জন্য তারা বৃক্ষপূজা করত [যে রীতি অদ্যাবধি ভারতবর্ষের লোকধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে টিকে আছে]। তারা জন্মান্তরে বিশ্বাস এবং আত্মার দেহান্তর গমনেও (Transmigration of soul) বিশ্বাসী ছিল। মাতৃরূপে উর্বরাশক্তির পূজাও যে তারা করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উর্ধ্বে বিস্তারিত পদদ্বয়ের মাঝখানে মাতৃমূর্তির যোনিদেশ বা নাভি থেকে শস্য চারা উঠছে এমন মূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটি বাঘ। এছাড়া জন্তু-জানোয়ারের প্রচণ্ড প্রাধান্য রয়েছে এদের সীলমোহরে, যা দেখে মনে হয় যে, এই সব জন্তু-জানোয়ার তাদের অভিজ্ঞান হিসাবে হয়তো কাজ করত। হয়তো তারা নানা গোষ্ঠীর আদি প্রাণী হিসেবে মর্যাদা লাভ করত, কারণ প্রাচীন কালে নানা দেশেই মানবসমাজ পশুকুল থেকে এসেছে এই বিশ্বাস ছিল [বিবর্তনবাদ অবশ্য একথা অস্বীকার করছে না। তবে সে পশু মানব আকৃতি লাভের পরে অনেকটাই রূপান্তরিত হয়েছিল—যে রূপান্তর ছিল মনুষ্য আকৃতি

তুল্য।] এই পশুকুলের মধ্যে বৃষমূর্তির সীলমোহর বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত [বৃষের শিল্পতাৎপর্য পূর্ববর্তী প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলির নানা অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে] মেসোপোটেমীয়রা এই বৃষকে সর্বোত্তম দেবতা বলে মনে করত। ভারতীয় যোগীরা চক্রভেদ করে যখন অনেক উর্ধ্ব সূক্ষ্ম পর্যায়কে মানসনেত্রে দেখতে পান তখন সেই সব পর্যায়ের পরমাত্মারূপ দর্পণে নানা জন্তু-জানোয়ারেরও মূর্তি দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা, এই সব মূর্তি সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মতর তরঙ্গের রূপ বিশেষ। ময়ূর, নানা ধরনের পাখি, ঘোড়া, হাতী, এ-সব তাঁরা দেখতে পান। কিন্তু বিশেষভাবে তাঁদের কাছে দৃশ্যমান হয় বৃষ। এই বৃষের মধ্যে এক মহতী অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ আছে বলে তাঁরা মনে করেন। এইজন্য ভারতবর্ষে প্রাগার্য যুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত বৃষ বিশেষ এক ধর্মীয় মাহাত্ম্য লাভ করে আছে। শিবের বাহন হিসেবে বৃষ তো দেবতার অনুরূপ মর্যাদাতেই মানুষের কাছে পূজ্য।

এখানকার অধিবাসীরা সাপের পুজো করতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। একদিন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ সাপের পুজো করত। সেই সর্পতত্ত্ব পূর্বে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। মহেন-জো-দড়োতে ধর্মীয় ফলকে বা সীলমোহরে সাপের যে ছবি পাওয়া গেছে ভারতীয় তান্ত্রিক ও যোগীরা তার একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যেমন, মহেন-জো-দড়োর মৃৎফলকে বীরাসনে ধ্যানমগ্না মুকুটধারিণী এক দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর দুইপাশে দুই ভক্ত যুক্তহস্তে নতমস্তক হয়ে আছেন। তাদের দুই পাশে বড় বড় দুই সাপ ফণা বিস্তার করে ছত্র ধরে আছে মাথার উপর।[৬৫] এতে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তার পাঠোদ্ধার হয়নি। কিন্তু ভারতীয় তান্ত্রিকেরা প্রতীকার্থ বিচার করে এই মূর্তিকে (দেবীমূর্তি) বৃত্তকা বা বগ ঋত্তকা অর্থাৎ ভগবতী ঋত্তকা বলে বর্ণনা করেছেন। এই বৃত্তকার অর্থ হল বৃত্তধর্মকারিণী বা বৃত্তধর্মযুক্তা। একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে গোলক-আকৃতি প্রসারলাভ করলে তবেই হয় বৃত্ত। বৃত্তের ধর্ম বহির্মুখী। ইংরেজীতে যাকে বলে centrifugal. কিন্তু এর সূত্র বাধা আছে বিন্দুতে—যে জন্য একই সঙ্গে কেন্দ্রাভিমুখীও বটে—ইংরেজীতে যাকে বলে centripetal.

শব্দ বা বাক্ হল এক ধরনের স্পন্দন (Vibration)। এই Vibration বৃত্তাকারে (যথার্থ অর্থে ডিম্ব আকারে) ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে বিশ্বভুবন, পশুজগৎ। এই বৃত্তকা শক্তিকেই পরবর্তিকালে কুলকুণ্ডলিনী বলে চিন্তা করেছেন ভারতীয় যোগী ও তান্ত্রিকেরা। এবং এরই ভিত্তিতে পশুজগতের অধীশ্বর হিসেবে পরমাত্মার চমৎকার রূপ কল্পনা করেছেন। সেই মূর্তি পাওয়া গেছে

পশুপতির সীলমোহরে। এখানে শৃঙ্গবিশিষ্ট ত্রিমুখ (চতুর্মুখও হতে পারে) এক দেবতা কূর্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর শিঙ্‌ বা শৃঙ্গ আছে (যে সম্পর্কে অর্থাৎ শৃঙ্গের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমখণ্ডে পূর্বেই আলোচনা করে গেছি)। এ ছাড়া তার লিঙ্গ উর্ধ্বমেঢ্র অবস্থায় আছে। তার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি পশু। যেমন, হাতী, বাঘ, গণ্ডার ও মোষ (সবাই স্থূল শক্তির প্রতীক)। তান্ত্রিকেরা এই প্রতীকের মধ্যে উন্নত ধরনের তন্ত্রতত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, পাশবদ্ধ জীবকেই তাঁরা মনে করেন পশু। সেই পাশবদ্ধ জীবের অভ্যন্তরেই পরমাত্মন বা পশুপতি বাস করেন। কূর্মাসনে বসা এই শৃঙ্গধারী দেবতাকে পশু পরিবৃত করে সেই উন্নত চিন্তার ইঙ্গিতই দিয়েছেন মহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা। তাঁর উর্ধ্বমেঢ্র এই বোঝায় যে, সেই পরমপুরুষ প্রকৃতিতে লিঙ্গ প্রদান করে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

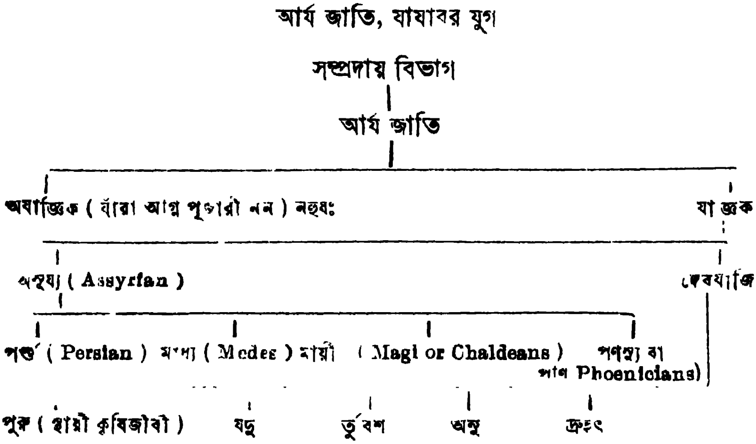
এই মহেন-জো-দড়ো ও হরাপ্পাতে আরও সুন্দর কল্পনার জিনিস পাওয়া গেছে, যাকে বলে শিবলিঙ্গ Heinrich Zimmer তাঁর Art of Indian Asia-তে সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের যথার্থ প্রমাণ ছবিসহ তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এই শিবলিঙ্গের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী অর্থ আছে। সৎ+চিৎ+আনন্দ-এর আনন্দ অংশের প্রতীক হল শিবলিঙ্গ—যোগীরা যাকে বিন্দু হিসেবে দেখতে পান। সৎ হল বোধাতীত নির্গুণ শূন্যতা। এর মধ্যে সুপ্তশক্তির প্রতিনিয়ত স্বভাবজাত স্পন্দন হচ্ছে—যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত। বোধাতীত নির্গুণ স্বভাবে এক সময় অস্তিত্ব বোধ অনুভব করেন। 'আমি' এই অস্তিত্ব বোধ হলেই 'তুমি' এই বোধ হয়। কারণ, তুমি ছাড়া আমি বোধ অসম্ভব। এই আমি বোধের সঙ্গে সঙ্গে যে 'তুমি' বোধ হয় সেটাই নির্গুণে ইচ্ছার (শক্তির) অভিঘাত স্বরূপ। সেই অভিঘাত বা বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শব্দ হয়; এই শব্দ সুপারসনিক শব্দ (Supersonic Sound) সেই জন্যই অশ্রুত। এই শব্দই 'ওঁ'। বিস্ফোরণে শব্দের আগেই আলোর প্রকাশ হয়। সেই আলোই 'বিন্দু'। যোগীরা যখন ষটচক্র ভেদ করে ক্রমশ সূক্ষ্মতর জগতে প্রবেশ করেন তখন সূক্ষ্ম চেতনা লাভ করে এই সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পান এবং সূক্ষ্ম আলোকে খুব কাছ থেকে দেখতে পান। তখন এই বিন্দুকে একটি গোলকের চতুর্দিকে বলয় সৃষ্টি করে ঘুরতে দেখা যায়। কখনও কখনও এই গোলক লিঙ্গাকার ধারণ করে, তার চারদিকে আলো-বৃত্ত ঘুরতে থাকে। এ হল অবিচ্ছেদ্য পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ। শক্তির স্বভাবে 'একের' মধ্যে আলোড়ন হয়েছে, কিন্তু শক্তি সেই 'এক' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই হন নি। বৈষ্ণবেরা এই ধরনের পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ককে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁদের ত্রিভঙ্গ হল—প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ ও

তম এই তিন গুণের ক্ষোভ স্বরূপ। এই গুণক্ষোভ হয় 'এক'-এর অন্তর্নিহিত ইচ্ছার বিস্ফোরণ হলে, তখন যে Supersonic Sound বা পরা শব্দ হয় তাই 'ওঁ'। বড় মধুর শুনতে। সেই 'ওঁ'-কে বৈষ্ণবেরা বাঁশী দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এবং দেহের ষটচক্রকে বাঁশীর ষড়রন্ধ্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। ভারতীয় তন্ত্রে সৎ+চিৎ+আনন্দের এই তিন অবস্থাকে কৃষ্ণ শিব (সৎ) শ্বেতশিব (চিৎ) ও শিবলিঙ্গ (আনন্দ—পুরুষ ও প্রকৃতি) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই লিঙ্গ চিন্তার মধ্যেই হয়তো আর্যদের লিঙ্গ সম্পর্কিত মহৎ চিন্তার বীজ লুক্কায়িত ছিল, যেমন, লিঙ্গ হল সদাশিব অর্থাৎ পুরুষের মনে যখন কেবলমাত্র জেগেছে বিশ্বকল্পনা কিন্তু তার বস্তুরূপ দেখা দেয়নি। একত্রে যুক্ত লিঙ্গ ও যোনি হল সেই প্রথম উন্মেষের প্রতীক। মূর্তি হল এর নিচের কল্পনা—ঈশ্বরতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত। লিঙ্গ হল লাঙলের প্রতীক, যোনি ক্ষেত্রের। লিঙ্গ ও লাঙল এই উভয় শব্দই অনার্য অর্থাৎ অস্ট্রীক। যোনি হল উপাদানকারণ এবং লিঙ্গ হল নিমিত্তকারণ। শিব যখন অরূপ তখন তার প্রতীক হল লিঙ্গ। যোনি হল মূলা প্রকৃতি।

সিন্ধু উপত্যকাতে বহু যোগারূঢ় মূর্তিও পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁরা যোগসাধনা জানতেন। (শহর-জীবনে বাস করার জন্যই এঁদের যোগ সাধনার প্রয়োজন ছিল। কারণ শহরের কর্মকোলাহলে ও কর্মব্যস্ততায় সহজে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়।) যোগের দ্বারাই বিশ্বজগৎ ও তার অন্তরালবর্তী সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হয়েছে। সুতরাং এই সভ্যতা যে খুবই উন্নত ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এই শিবলিঙ্গ পূজাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। ফলে লিঙ্গ পূজারীদের 'শিশ্নেদেবাঃ' বলে বিদ্রূপ করেছেন। পরে এর মূল্য বুঝতে পেরে নিজেরাই এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন।

আর্যদের অধ্যাত্ম সাধনায় 'যজ্ঞ' ছিল বিরাট ব্যাপার। 'যজ' ধাতু থেকে যজ্ঞ, অর্থাৎ Sacrifice বা ত্যাগ করা। নির্গুণ পুরুষ আত্মস্বরূপ ত্যাগ করেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। আবার জগৎ-স্বভাব ত্যাগ করলেই নির্গুণস্থ হন। যজ্ঞের এই মহৎ ভাব এতকাল আর্যদের অবদান বলেই ধারণা ছিল। তবে বর্তমানে আর্যপূর্ব ভারতের লোথাল অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে এমন অনেক গৃহের নিদর্শন—যেখানে ছিল রোদে শুকানো ইটের যজ্ঞকুণ্ড। এই কুণ্ডে ছাইয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এর কাছে যূপের অস্তিত্বেরও প্রমাণ মিলেছে। সুতরাং আর্যদের যজ্ঞের ধারণাও হয়তো আর্য-ধারণা নয়। তবে অনেকে সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভাবকদেরও অনার্য মনে করেন নি, আর্য বলেই মনে করেছেন। ভারতবর্ষে যাজ্ঞিক আর্যরা

এদের 'পণি' অর্থাৎ বণিক বলে উল্লেখ করেছেন। এই নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছেন হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. তাঁর 'বৈদিক তত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান' গ্রন্থে। সেখানে তিনি নিম্নরূপ ডায়াগ্রাম দিয়েছেন :



ঋগ্বেদের রুদ্রের পূর্বসূরীই হলেন হয়তো সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি। ঋগ্বেদের রুদ্র অনার্য বা প্রাগার্য ভাবধারাপুষ্ট। অথর্ব বেদে তিনি ভব বা পশুপতি নাম লাভ করেছেন। এই রুদ্রই দ্রাবিড় ভাষায় শিব। সংস্কৃতে রুদ্র অর্থ রক্তবর্ণ। দ্রাবিড়দের শিব অর্থও রক্তবর্ণ। শিব হল তামিল ভাষায় শিবন (রক্ত বর্ণ), শম্ভু বা শেম্বু অর্থ তাম্রবর্ণ। আর্যরা এই দুটি শব্দকে এক করে করেছেন শিবশম্ভু। ঋগ্বেদের রুদ্র গাছ-গাছড়া ও জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে যুক্ত। সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি বৃক্ষ নিম্নাসনে রয়েছেন। সিন্ধুউপত্যকার কূর্মাসনে উপবিষ্ট পশুপতি শুধু যে ভারতে শৈবসাহিত্য ও তন্ত্রকেই প্রভাবিত করেছেন তাই নয়, পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের মূলও হয়তো ছিলেন তিনিই। গৌতম বুদ্ধ এবং এই পশুপতির মূর্তির মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, উভয়েরই বসার ভঙ্গী প্রায় একরকম। উভয়েরই মাথার উপরে ত্রিপত্র যুক্ত পাতা রয়েছে। সিন্ধুউপত্যকার পশুপতির মাথার শিরস্থানে শৃঙ্গযুক্ত এমন এক মুকুট রয়েছে যা তিনভাগে বিভক্ত। এর সঙ্গে নিবিড় মিল রয়েছে সাঁচী স্তূপের উত্তর তোরণ শীর্ষের। এই প্রতীক হয়তো বৌদ্ধ ত্রিত্বে (Trinity)-র প্রতীক, যেমন, বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। তেমনই সিন্ধুউপত্যকার পশুপতির শিরস্ত্রাণও হয়তো কোন মহৎ ত্রিত্ব ভাব প্রকাশ করত। হয়তো এই ত্রিত্ব হল শৈব তন্ত্রের কৃষ্ণ শিব, শ্বেত শিব ও শিবলিঙ্গ, অর্থাৎ 'সৎ+চিৎ+আনন্দের প্রতীক।'

সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি যেমন পশুপরিবৃত, তেমনই গৌতম বুদ্ধের সিংহাসনের নিচেও রয়েছে এক জোড়া হরিণ। এবং পশু অধ্যুষিত কোন স্থানেই গৌতম বুদ্ধ প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন যেমন, মৃগশিখা বনে। পরবর্তিকালে দেখা যায় বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সর্বত্রই পশুর ছড়াছড়ি। অশোকচক্রে বৃষ, অশ্ব, সিংহ সবই আছে। বৌদ্ধদের স্থাপত্যকীর্তিতে স্তম্ভ এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে আছে। ঐতিহাসিক A. L. Basham-এর মতে এই স্তম্ভ সিন্ধুউপত্যকার লিঙ্গেরই স্মারক। বৌদ্ধ মতবাদে অহিংসার প্রাধান্য। সিন্ধুউপত্যকাতেও আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব দেখে মনে হয় যে, এরাও হিংসাকে তেমন প্রশ্রয় দেয়নি।

বৈদিক সাহিত্যের অনেক পূর্বসূরী-ধারণাও এই সিন্ধুউপত্যকাতে ছিল বলে মনে হয়। ঋগ্বেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী দুই পাখির যে গল্প আছে অনুরূপ পাখিযুক্ত সীলমোহরের অস্তিত্ব সিন্ধুউপত্যকার একটি সীলমোহরে পাওয়া গেছে। এই সীলমোহরটির অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—শিলচরের পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাঙ্খ্যার্ণব। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে এমন সীলমোহর পাওয়া গেছে যাতে পক্ষবিস্তৃত ঈগল মস্তিষ্ক বামদিকে হেলিয়ে রয়েছে দেখা যায়। মনে হয় তার প্রত্যেকটি ডানার উপর একটি করে সাপ রয়েছে। সম্ভবত বেদের গরুড়-এর পূর্বসূরী এই ঈগলটি। এ-সব দেখে মনে হয় যে, প্রাগ্‌বৈদিক যুগে এই সিন্ধু-উপত্যকাতেই বৈদিক যুগের সকল ধ্যান-ধারণার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল—এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এখানেই। গ্রীস যেমন ইউরোপীয় সভ্যতার দোলনা তেমনই সিন্ধুসভ্যতাও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার দোলনা-স্বরূপ।

তিন

শিখধর্ম

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাঞ্জাবে শিখধর্মের উদ্ভব। শিখধর্মের যখন উদ্ভব হয় তখন এখানে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে কিনা। শিখধর্মে এ প্রশ্নের ভিন্ন ধরনের জবাব দেওয়া হয়েছে।

গুরু নানক শিখধর্মের উদ্ভাবক। গুরু নানকের সময় ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। গুরু নানক যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর নয়জন উত্তরাধিকারী তাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঈশ্বরের সরাসরি সাযুজ্য লাভই ছিল এই ধর্মের

লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম সাধক একটি গোষ্ঠী পরিবেশের প্রভাবে সামরিক একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শিখধর্ম বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য একে Ethnic Religion আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গুরুবাদই শিখধর্মের মূল কথা। গুরু সম্পর্কে এদের ধারণা নিম্নরূপ :

(১) ঈশ্বরই প্রকৃত গুরু। তাঁর ঐশ্বরিক ও সজীব বাণী মানুষের কাছে এসেছে ঐতিহাসিক ব্যক্তির মাধ্যমে। এঁরা সংখ্যায় দশজন। এঁরা প্রত্যেকেই গুরু হিসেবে চিহ্নিত।

(২) শিখ দশম গুরুর ধারণা ধরে রাখার জন্য শিখ সম্প্রদায়ও গুরু হিসেবে পরিচিত।

(৩) শিখদের ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থসাহেবও গুরু নামে চিহ্নিত।

ঈশ্বরই হল যথার্থ গুরু বা সদ্গুরু। যে ব্যক্তি ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, তাঁর সেবা করে, ঈশ্বর তাকেই অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বোধিত করেন। ঈশ্বর উত্তরণ পর্যায়ে নিরাকার, বর্ণনাতীত। কিন্তু এই যদি তাঁর যথার্থ সত্তা হয়, মানুষ তাঁকে কোনদিনই বুঝতে পারবে না। ঈশ্বরের যদি কোন গুণ মানুষ না বুঝতে পারে তাহলে তাঁর কাছে মানুষ কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না। সুতরাং নানা প্রাকৃত জিনিসের মাঝখানে ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় রাখেন। মানুষ এই অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু ঐশ্বরিক কিছু চরিত্রের কথা বলে বলেই শিখরা যে মনে করেন তিনি অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা নয়। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেই মানুষ ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় পায়। ঈশ্বরের করুণায় মানুষ পূজা অর্চনা ও ধ্যানের মধ্যে তাঁর পরিচয় পেয়ে থাকে।

আদিতে শিখধর্ম ছিল মরমিয়া ও ভক্তিবাদী। নানকের শিষ্যরা ঈশ্বরের গুণকীর্তনের মধ্যেই তাঁদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। নানক ঈশ্বর সম্পর্কে যে ভজন লিখেছিলেন সেই ভজনের মধ্যে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করতেন। এই ভজনে যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করতে পারতেন নানক তাঁদের নিয়ে একটি ভক্ত মণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, এই ভজনের মাধ্যমেই ভক্তবৃন্দ ঐশ্বরিক সত্তা অনুভব করতে পারলে ঈশ্বরও তাঁদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন। নানক এইভাবে অনুরক্ত একদল ভক্ত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলে গুরু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বর সান্নিধ্যের পথনির্দেশ দিতে পারেন তিনিই গুরু হিসেবে স্বীকৃত হন। তবে নানক ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ হিসেবে কখনই ভক্ত মণ্ডলীর কাছে প্রতিভাত হন নি, বা অবতার বলে গণ্য হন নি।

নানকের অনুগামী নয়জন শিখ গুরুও নানকেরই মত একই সত্য ও একই ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস আছে। শিখদের মতে দশজন শিখ গুরু (Guide) হলেন দশটি মোমবাতির মত, যার একটি মোমবাতি আর একটি মোমবাতি থেকে একই আগুনকে মোমশিখারূপে লাভ করেছিলেন। শিখদের এই দশজন গুরু হলেন নিম্নোক্ত দশজন সাধক :

(১)	নানক	১৪৬৯—১৫৩৯ খ্রীঃ
(২)	অঙ্গদ	১৫০৪—১৫৫২ „
(৩)	অমরদাস	১৪৭৯—১৫৭৪ „
(৪)	রামদাস	১৫৩৪—১৫৮১ „
(৫)	অর্জুন	১৫৬৩—১৬০৬ „
(৬	হরগোবিন্দ	১৫৯৫—১৬৪৪ „
(৭)	হররাই	১৬৩০—১৬৬৪ „
(৮)	হরকৃষাণ	১৬৫৬—১৬৬৪ „
(৯)	তেগবাহাদুর	১৬২১—১৬৭৫ „
(১০)	গোবিন্দ সিং	১৬৬৬—১৭০৮ „

এঁরা প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর জীবনের শেষ ভাগে গুরু বা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রথম পাচজন গুরুর সময়ই অধিকাংশ শিখধর্মতত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল। এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে সমকালীন উত্তর ভারতের মরমিয়া অধ্যাত্মসাধনার একটি নিকট সম্পর্ক ছিল। এই সময় উত্তর ভারতের মরমিয়া সাধকেরা ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাজুয্য লাভ করবার চেষ্টা করতেন।

শিখধর্মের মধ্যে দুটো দিক অত্যন্ত প্রবল। যেমন (১) মরমিয়া ভাবনা ও (২) আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণাত্মক ভঙ্গী।

শিখধর্ম প্রথম দিকে মরমিয়াপন্থী হলেও যে বাস্তবজ্ঞান হীন ছিল তা নয়। ফলে প্রত্যেকটি শিখ ধর্মগুরুর অবদানই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

(ক) নানকের বক্তব্য ছিল—হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। ফলে উভয়ের সমন্বয়ে শিখরা নতুন এক অস্তিত্ব লাভ করে। নানকের ধর্মবিশ্বাসই পরিণতিতে শিখজাতিকে একটি সামরিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব দান করেছিল।

(খ) অঙ্গদ অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে দৈহিক উৎকর্ষও পছন্দ করতেন। সেই

জন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে দৈহিক দিক থেকে উন্নত এই সম্প্রদায় প্রয়োজনে সহজেই সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(গ) অমরদাস লঙ্গরপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে এক উনানে রান্না হত, একত্রে এক পাতে ভোজন হত। [পুরির জগন্নাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভোজনের মত]। এর খরচা শিখরা সমবেতভাবে বহন করত। বিশেষ বিশেষ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত শিখরা এই লঙ্গর-এ সমবেত ভোজনের আয়োজন করত। উদ্দেশ্য ছিল শিখদের মধ্যে শ্রেণীভেদ দূর করা। এতে শিখদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব শক্তিশালী হয়। অ-শিখকেও এরা স্বাগত জানাতেন।

শিখদের এই শ্রেণীভেদ দূরীকরণ হিন্দুসমাজব্যবস্থায় যে শ্রেণীভেদ ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। রক্ষণশীল পুরোহিততন্ত্রও এঁরা অস্বীকার করেছিলেন। মুসলমান আক্রমণের মুখে শিখদের শ্রেণীভেদ-এর মানসিকতা আরো ভেঙে যায়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে বর্তমান শিখদের মধ্যে কিছুটা শ্রেণীভেদ এখনো আছে। শিখপন্থায় ঈশ্বর-অনুরাগীদের মধ্যে কোন ভেদ থাকা উচিত নয় এ-বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ভেদপ্রথা সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি।

শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জন শিখধর্মে এক নবপর্যায়ের সূচনা করেন। তিনিই অমৃতসরের বিখ্যাত হরিমন্দির বা স্বর্ণমন্দির তৈরি করেন। এই মন্দিরই শিখধর্মের মূলকেন্দ্র।

শিখধর্ম সামরিক চরিত্র লাভ করে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে। গুরু গোবিন্দ সিংহ একে সম্পূর্ণ সামরিক চরিত্র দান করেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের শেষ গুরু। এরপর শিখদের পরিচালনা করার দায়িত্ব তিনি শিখসম্প্রদায়ের হাতেই অর্পণ করেন। তাছাড়া শিখ ধর্মগ্রন্থগুলিও তিনি সংকলন করেন। তিনি শিখসমাজকে পরিচালনা করার যে পথ-নির্দেশ দান করেন তা 'গুরুপন্থ' ও শিখদের যে ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন তা 'গুরুগ্রন্থ' নামে পরিচিত হয়।

গুরুপন্থ গঠন নিয়ে চমৎকার একটি গল্পও আছে। ভক্ত সমাবেশ আহ্বান করে তিনি মনুষ্য বলি দেবেন বলে স্বেচ্ছায় বলি হতে ইচ্ছুক ভক্তদের আহ্বান করেন। অনেক চিন্তার পর পাঁচজন শিখ গুরুর কাছে নিজেদের বলি দেবার উদ্দেশে এগিয়ে আসেন। তিনি যে যথার্থই তাঁদের বলি দেন তা নয়। এদের নতুন পোশাক পরিয়ে ভক্তসমাবেশে উপস্থিত করেন। এই পাঁচজন শিখকে

তিনি নিজের প্রিয়তম ব্যক্তি বলে ঘোষণা করেন। এঁরাই খালসা নামে নতুন পবিত্র শিখসমাজের প্রতিনিধি হন। এঁদের আত্মোৎসর্গের আদর্শই হয় খালসা আদর্শ। এরই ভিন্ন নাম গুরুপন্থ। ঐতিহাসিক গুরুদের আদর্শের প্রতি যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন তাঁরাই খালসা নামে পরিচিত হন। শুদ্ধ নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই খালসা। খালসা অনুগামীরা সিং (সিংহ) ও কাউর (রাজকুমারী) এই উপাধি প্রাপ্ত হয়। পুরুষদের উপাধি হয় সিং ও মহিলাদের কাউর। এই একই ধরনের উপাধি ধারণ করার জন্য শিখদের মধ্যে আর শ্রেণীভেদের প্রশ্ন থাকে না।

পনের বছর প্রাপ্ত হলেই শিখ যুবক ও যুবতীরা বা কিশোর কিশোরীরা খালসার সদস্য হতে পারে। খালসার পঞ্চপ্রধান নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থনাসঙ্গীত শেষে চিনির শরবত তৈরি করে দীক্ষাগ্রহণকারীদের চোখে মুখে ও মাথায় তা ছিটিয়ে দেন। এরপর তাদের খালসার নিয়মকানুন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন, তারা কেশ কর্তন করবে না, লাম্পট্য ও তামাকু সেবন এড়িয়ে চলতে হবে এবং মুসলিম প্রথায় কর্তিত পশুমাংসও তারা ভক্ষণ করতে পারবে না।

শিখ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্রই হল শিখ ধর্মগ্রন্থ বা গুরুগ্রন্থ। গুরুগ্রন্থ পাঠ করেই সমগ্র অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এ থেকেই নানা প্রার্থনা ও সঙ্গীত গীত হয়। ঐতিহাসিক দশজন পুরুষের অধ্যাত্ম কবিতা এতে সংকলিত আছে। মূলত গুরু-গ্রন্থ গুরু অর্জন সিংয়ের প্রচেষ্টাতেই সংকলিত হয়েছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহ এর চূড়ান্ত রূপ দেন বা চূড়ান্ত সংস্কার সাধন করেন। এতে গুরু অর্জনের পর যে সব গুরু এসেছিলেন তাঁদের বাণী বা অধ্যাত্ম কবিতাও স্থান লাভ করে। এই সংকলন আদিগ্রন্থ নামে পরিচিত। এতে গুরু গোবিন্দ সিংহের নিজের অধ্যাত্ম সংগীত বা কবিতা স্থান পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একজন শিষ্য গুরু গোবিন্দের অধ্যাত্ম সংগীতগুলিকেও এতে স্থান দেন। তার নাম হয় দশমগ্রন্থ অর্থাৎ দশম গুরুর অধ্যাত্ম কবিতা সংকলন। গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন শিখ ধর্মশাস্ত্র সংস্কার করেন তখন তিনি শিখধর্মের সংগঠনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনেন। শিখদের জন্য তিনি দৃঢ় এক সমাবেশের ভিত্তি তৈরি করেন। কোথায় কোথায় শিখদের ধর্মীয় সমাবেশ ঘটবে এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ নির্দেশ দেন। ভারতীয় প্রায় সব ধর্মেই এ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় কেন্দ্র আছে। যেমন, মন্দির, পীঠস্থান, নদনদী, সাধুসন্ত ইত্যাদি।

গুরু নানক অধ্যাত্মসাধনার জন্য বাহ্যিক কোন জিনিসকে তেমন মূল্য দিতেন

না। সৎ হৃদয় ও সপ্রেম ঈশ্বরচিন্তা বা ধ্যানের উপরই তিনি বেশি জোর দিতেন। কিন্তু আধুনিক শিখরা বাহ্যিক নানা জিনিসকেও ধর্মীয় মূল্য দিয়ে থাকেন।

গুরু গোবিন্দ যখন অধ্যাত্ম সত্যের উৎস হিসেবে একটি ধর্মগ্রন্থ সংকলনকে নির্দিষ্ট করে দেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি বিরাট এক মূল্য লাভ করে। শিখধর্মের একমাত্র কেন্দ্র এখন এই গ্রন্থটি। হিন্দুরা যেমন দেবদেবীর কাছে মাথা নোয়ায় শিখরা নোয়ায় এই ধর্মগ্রন্থটিব কাছে। শিশুদের যখন গুরদোয়ারাতে নিয়ে আসা হয় তখন এই ধর্মগ্রন্থ থেকে অবিরাম পাঠ হতে থাকে—উদ্দেশ্য এই পাঠ থেকে শিশুর নাম ঠিক কবা। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সময় শিখ দম্পতি চারবার এই গুরুগ্রন্থ পরিক্রমা করেন। এই সময় বিবাহিত দম্পতির দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সংগীত গীত হয়। মৃত্যু হলে শোক জ্ঞাপনের জন্য বা আত্মার শান্তি কামনার জন্য এই গুরুগ্রন্থ থেকে সাতদিন বা দশদিনেব জন্য এক নাগাড়ে পাঠ হয়ে থাকে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মোৎসব বলে গণ্য হয় তখনই যখন দুদিনেবও বেশি এক নাগাড়ে গুরুগ্রন্থ থেকে পাঠ হয়।

শিখদেব মন্দিবকে বলে গুবদোয়ারা। গুরদোয়ারা অর্থ গুরুর দুয়ার। এখানেই গুরুগ্রন্থ রাখা হয়। শিখদের সকল সমাবেশ এই গুরুগ্রন্থকে কেন্দ্র কবে গুবদোয়াবাতেই হয়ে থাকে। গুরুগ্রন্থ ও গুরুপন্থ এই দুয়েব মধ্যেই যথার্থ গুরু থাকেন।

শিখধর্মে পুরোহিতের কোন প্রশ্ন নেই। যে-কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পবিচালনা করতে পারেন। তবে এজন্য অর্থাৎ গুরুগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করার জন্য কেউ কেউ বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ভাবতে সমাবেশভিত্তিক ধর্ম যত আছে তার মধ্যে শিখধর্ম ও মুসলমান ধর্মই প্রধান। এই ধর্মেব মধ্যেই তাব সম্প্রদায়ের পরিচয়। হিন্দুধর্মে ধর্ম এক হলেও নানা সম্প্রদায় আছে। অবশ্য বর্তমানে শিখদেব মধ্যেও নানা শ্রেণীর উদ্ভব বা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

শিখধর্মে ethnic চরিত্র বা সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রবল হলেও এ ধর্মের অধ্যাত্ম-সাধনা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গুরুগ্রন্থে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হবে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিখ অধ্যাত্মচিন্তা ও মানুষ সম্পর্কিত ভাবনাকে তত্ত্বের পর্যায়ে ফেলা চলে না। ঈশ্বর সন্ধানে ধর্মজীবন যাপন কালে শিখগুরুদের যে অভিজ্ঞতা তাই তাঁদের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুদের উপনিষৎ বা ষড়দর্শনের মত এর কোন শিক্ষাগত ধারা নেই।

শিখরা মনে করে যে, মানুষ ধর্মজীবন আরম্ভ করলেই নিজেকে পৃথকভাবে দেখতে আরম্ভ করে। মানুষ তখনই বুঝতে পারে যে, পার্থিব নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অহংকার দ্বারা সে পরিবৃত। নানা সংকীর্ণতা দোষে সে দুষ্ট। বাস্তব জগতের লাভালাভ মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ করে রাখে। বস্তুজগৎসমুদ্রে সে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

পাপীর একমাত্র আশা এই যে, সৎগুরু (ঈশ্বর) করুণাময়। তিনি সত্যসন্ধানী ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে তাঁকে উত্তরণের পথে নিয়ে যান। সত্যসন্ধানীদের সঙ্গে একত্রে ঈশ্বর-পথের পথিককে ঈশ্বরজ্ঞানীদের ভজন গান করতে হবে। শিখরা মনে করে যে, ঈশ্বরের নামের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। সুতরাং পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলিকে শ্রদ্ধাসহকারে ও সপ্রেমে পাঠ করলেই ঈশ্বর তাঁকে করুণা করবেন ও আত্মজ্ঞান দান করবেন। সত্য সন্ধানী তখন গুরুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন।

প্রিয়তমা ভার্যা যেমন স্বামীর প্রতি ভালবাসা অনুভব করেন, তেমনই ঈশ্বর-ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি প্রেমানুভব নিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করলেই তাঁকে পাবেন। এই ধরনের ভাবনা শিখধর্মকে মরমিয়া ভাব দান করেছে। এ ভাব কিছুটা বৈষ্ণবদের ভগবৎপ্রেমের ভাব। ঈশ্বর অবর্ণনীয় হলেও তিনি করুণাময়। শাশ্বত ও সর্বশক্তিমান হিসেবে তিনি প্রতীয়মান হন। তিনি একটি ক্রিমিকীট থেকে হাতি পর্যন্ত সর্বত্রই বিদ্যমান।

যথার্থ অধ্যাত্ম পর্যটন হল হৃদয়ে। তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলে হবে না। ব্যক্তির ভাবকে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। শিখ ঈশ্বরতত্ত্ব মনমুখ ও গুরুমুখ। মন দ্বারা বোঝায় মন ও হৃদয়ের সমন্বয়ে একজন মানুষের সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে। গুরু দ্বারা বোঝায় ঈশ্বরকে। মুক্তির পথ হল ঈশ্বরকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক নয়।

জগৎ ও মানুষ মায়া দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্যই যথার্থ জ্ঞান হয় না। এও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। তবে শিখদের কাছে এটা একটা সমস্যা নয়। নঙর্থকভাবে মানুষ জগতের দিকেই বেশি আকর্ষণ বোধ করে। কারণ তারা হওমেইনের (haumain) প্রভাবে অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক মানুষের অহংকারের মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বরের গুণকীর্তন দ্বারাই মানুষ এই অহংভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। তবে ঈশ্বরের করুণা না হলে মানুষের অহংকার যাবার নয়। পার্থিব রোগ ঈশ্বরের করুণা ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না। প্রেমে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে তবেই মুক্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব।

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনকে শিখরাও সহজ বলে থাকে। [এ যেন বৌদ্ধ মহাযান-এর প্রভাবে বাংলার সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের ভাব]। এই মিলনের জন্য জীবকে বহুবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বর দর্শন হলে তবেই এই জন্মগ্রহণ করার পালা শেষ হয়। স্বল্পসংখ্যক মানুষই তাঁকে যথার্থভাবে কামনা করে এবং আরো স্বল্প সংখ্যক মানুষ তাঁকে পেয়ে থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও প্রেমের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। সেবা শিখধর্মে একটি বড় ব্যাপার। খালসা সদস্যরা শ্রম থেকে মহৎ কর্ম ইত্যাদি নানা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেবার মধ্যে আছে গুরুদোয়ারা ঝাড়ু দেওয়া, ভক্তজনের জন্য খাদ্য তৈরি করা প্রভৃতি।

শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থে'র রচনাবলী কাব্যময় ও অলংকারপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বাইবেলের psalm-এর সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। তবে অধ্যাত্মতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সে ভাব গুরুগ্রন্থে নেই। গুরুগ্রন্থের রচনা এমন, যাতে অনুরাগীর হৃদয় ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। যেমন, গুরুগ্রন্থে আছে :

যে-লোক আত্মস্বার্থমগ্ন—সে বিনা জলেই ডুবে আছে। তার মন হল ভেকের মত। পাপ কাদার মত। তবু যথার্থ সমুদ্র হলেন ঈশ্বর স্বয়ং। অনুগত জন সেখানে ক্ষুদ্রকায় মাছের মত। মানুষ যখন তার এই ক্ষুদ্রতা অনুভব করতে পারে তখনই সে ঈশ্বর সাজুয্য লাভ করতে পারে। এই মিলন হল ধাতুর সঙ্গে ধাতুর অথবা জলের মধ্যে জলের মিলে যাওয়া। এই মিলন সৎগুরু বাক্য দ্বারাই লাভ করা যায়। গুরুবাক্যই মানুষের হৃদয়কে ভেদ করতে পারে। এ বাক্য শাশ্বত। এ বাক্য দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে। এ বাক্য মানুষের মধ্যে আসার অর্থ হল হৃদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হবার মত। এই বাক্যই জাহাজের মত, যার দ্বারা সংসারসমুদ্র পার হওয়া যায়। এ বাক্য ঘুমন্তকে জাগ্রত করে এবং কামতাপ দগ্ধকে শান্ত করে। এ অভিজ্ঞতা হলে কেউ আর বলবে না যে, তিনি এ অভিজ্ঞতার যোগ্য ব্যক্তি। তার নিজের এ যোগ্যতা ও পবিত্রতা নেই। ঈশ্বর স্বয়ং হাত ধরে তাঁকে পবিত্র করে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের করুণাতেই মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সৎগুরু সাধনে মানুষ অগ্রসর হতে পারে।

শিখরা নানা ভাবে তাদের ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। তবে সকলের লক্ষ্যই এক—ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। এ ধর্মের একটি দিক যথার্থই মূল্যবান. সেটি এই যে, শিখরা পণ্ডিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধ্যাত্ম জগতে সাধক ব্যক্তির মূল্যই বেশি দেন। [বস্তুত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি ঈশ্বর থেকে

বহুদূরে অবস্থান করেন। ভারতীয় তন্ত্র ও যোগ সাধনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নিজের মধ্যে অনন্তের স্বাদ লাভ করেছেন ও ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁরা জানেন যে, শুধুমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তির ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। যেমন যোগী অরবিন্দ আত্মার স্বরূপকে বলেছেন উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। যোগ মাধ্যমে এই উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ পর্যায়ে না যেতে পারলে কারো পক্ষেই এর স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। [যোগতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য] এই জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা শিখরা সাধনার উপরই বেশি জোর দেন।

শিখরা সাধারণত গুরুগোবিন্দ নির্দেশিত পাঁচটি প্রতীক দ্বারাই চিহ্নিত হয়। যেমন,

(১) কেশ [অকর্তিত কেশ]

(২) কঙ্ঘ [কেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য চিরুনী]

(৩) কর [ধাতু বালা]

(৪) কচ্ছ [হাঁটু পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র]

(৫) কৃপাণ [তলোয়ার]

এরা প্রায় প্রত্যেকেই মাথায় উষ্ণীষ পরিধান করে। শিখরা নিজেদের গোষ্ঠী-ধর্ম রক্ষায় বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকেন।

চার

চীনের অধ্যাত্মসাধনা

চীনের অধ্যাত্মসাধনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মানুষের অধ্যাত্মসাধনায় চৈনিকরাই বোধহয় এমন এক জাতি যারা এককভাবে কিছু অধ্যাত্মচিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। প্রথম দিকে তাদের অধ্যাত্ম চিন্তার উপর বহির্জগতের অন্য কোন ধর্মের প্রভাব নেই। চীনে অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে তিনটি ধারাই প্রবল—

(১) কনফুসীয় ধারা

(২) তাও ধারা ও

(৩) বৌদ্ধ ধারা।

কনফুসীয় অধ্যাত্মচিন্তা ও তাওবাদ বহির্জগতের অন্য কোন ধর্মের সংস্পর্শে আসার আগেই চীনে গড়ে উঠেছিল। ফলে চীনের নিজস্ব অধ্যাত্মচিন্তা পৃথিবীর অন্য দেশের অধ্যাত্মচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলামে

যেমন অধ্যাত্মসাধনা 'একঈশ্বর'কেন্দ্রিক, চীনের কনফুসীয় ধর্ম ও তাওবাদ সে রকম নয়। ঈশ্বরের চরিত্র ও কার্যপদ্ধতির উপর কোন প্রকার আলোচনা না করেই কনফুসীয়সের মতবাদ ধর্মীয় চরিত্র লাভ করেছে। কনফুসীয়সের ধ্যান-ধারণা প্রাক্ আধুনিক চীনের ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে রেখেছিল।

চীনে অতি প্রাচীনকালে মানুষ কি ধরনের অধ্যাত্মচিন্তায় বিশ্বাসী ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৫১—১০৫০ অব্দে শাঙ রাজত্বকালেই চীনের ধর্মসাধনার প্রকৃতি ছিল কিরকম তা ভাল করে জানা যায় না। তবে শাঙদের সময় যে চীনে কোন অধ্যাত্মচিন্তা ছিল না তা নয়, বরং ধর্ম একটা মূল্যবান ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। শাঙদের আমলে চীনের মানুষ প্রাচীন উপজাতীয় মানুষের মত অতীন্দ্রিয় কিছু শক্তি ও আত্মাতে বিশ্বাস করত। এদের উপরই তাদের ভাগ্য নির্ভরশীল তারা এ রকম ভাবত। ফলে এইসব শক্তি ও আত্মাকে খুশি করার জন্য প্রাচীন চৈনিকরা এঁদের উদ্দেশে নানা জিনিস অর্পণ করত ও বলি দিত।

ভবিষ্যৎ গণনার দ্বারা শাঙ আমলের চৈনিকরা এইসব শক্তি বা আত্মাদের মনমেজাজ বোঝার চেষ্টা করত। তাদের কিছু সংখ্যক জাদু হাড় ছিল যা দ্বারা তারা গণনা করত। শাসকদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার জন্য এই গণৎকারেরা এইসব অদৃশ্য শক্তি বা আত্মার কাছে উত্তর জানতে চাইত। উত্তর পেত কচ্ছপের পিঠে কিংবা বলদ বা ষাঁড়ের কাঁধে। শাঙ আমলের মানুষ প্রতিপদেই এই অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ লাভ করার চেষ্টা করত।

শাঙ যুগের অধ্যাত্মসাধনা অস্পষ্ট হলেও পরবর্তী চৈনিক ধর্মসাধনা থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা সিন্ধুসভ্যতার অধ্যাত্মসাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। চৈনিকরা এ-সময় থেকেই প্রকৃতির সাম্যগুণে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসই তাওবাদে yang ও yin (ভারতে হংস-এর মত)-রূপ লাভ করেছিল। আলো-অন্ধকার, নরম-শক্ত, পুরুষ-রমণী এইভাবে দুইয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও সমন্বয়েই বিশ্ব।

চীনের আর একটি অধ্যাত্ম দিক হল এই যে, মানুষ সম্পর্কিত চিন্তা, মানব-কল্যাণের জন্য চিন্তা। এই মানবকল্যাণ চিন্তা পরবর্তিকালে স্বর্গীয় ইচ্ছা রূপে (Ten-ming) ব্যক্ত হয়েছে।

কনফুসীয় চিন্তা প্রকাশিত হবার আগে শাঙ ও চৌ আমলে চৈনিক অধ্যাত্ম-চিন্তার কয়েকটি দিক সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। এর মধ্যে একটি হল আত্ম-

চিন্তা বা জগৎচিন্তা। চৌ-আমলে বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গ মানুষের কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন থাকে। তারা বিশ্বাস করত যে, অতীন্দ্রিয় সত্তা মানুষেরই মত দেখতে ও শুনতে পান। সুতরাং মানুষ সম্পর্কে তারা উদাসীন নন। বিশ্বজগতের এই মঙ্গলচিন্তা বা সাম্যচিন্তা চৈনিক ধর্মকে ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম থেকে পৃথক এক সত্তা দান করেছে। পরবর্তী তিনটি ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা ভীতি স্থান লাভ করে আছে, অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে অন্যায় হয়, তার ফলে মানুষকে শাস্তি লাভ করতে হয়। অর্থাৎ এক কথায় এই তিনটি ধর্মে পাপবোধ আছে। কিন্তু প্রাচীন চৈনিক ধর্মে ও ভারতীয় ধর্মে এই পাপবোধের কোন স্থান ছিল না।

চৈনিক ধর্ম মানুষের নৈতিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। জগৎ-ছন্দ ও তাতে অংশ গ্রহণ-এর চিন্তা চৈনিক অধ্যাত্মতাকে একটি বৈশিষ্টতা দান করেছে। এই ছন্দের সঙ্গে (ভারতীয় ঋত্-এর মত) সমতা রক্ষা করে চলা ও মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা তাদের অধ্যাত্মচিন্তার একটি বড় দিক।

কনফুসীয় ধর্ম ও তাওবাদ, অধ্যাত্মচিন্তা না দার্শনিক চিন্তা এ নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে নানা সংশয় আছে। এর মধ্যে কি কোন মরমিয়া ভাব আছে যা অনুরাগীদের ঈশ্বর সাযুজ্য দান করতে পারে?

চীনের লোকেরা নিজেরাই এর জবাব দিয়েছেন দুটি শব্দে—চিয়া ও চিয়াও। চিয়া (chia) শব্দের অর্থ দর্শন, চিয়াও (chiao) শব্দের অর্থ ধর্ম। চিয়া দ্বারা বোঝায় মনীষীদের চিন্তাধারা। চিয়াও দ্বারা বোঝায় কি করে সাধারণ মানুষ সেই চিন্তাধারাকে তাদের ব্যক্তিগত চর্চা দ্বারা আয়ত্ত করেছেন। সুতরাং চৈনিক জীবনে আছে চিন্তাজাত দর্শন ও অনুষ্ঠানজাত সাধনা। চৈনিকরা চিয়া ও চিয়াও-এর মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য করে নি। 'এক' সত্যেরই এই ধারাদুটি হল দুটি দিক। এরা পৃথক কিন্তু নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত। চীনের প্রত্যেকটি ধর্মই এই দ্বি-পন্থা অবলম্বন করেছে।

কনফুসীয়সের মতবাদ চৈনিক ভাষাতে 'জু' (Ju) অর্থাৎ পণ্ডিত নামে পরিচিত। ফলে চৈনিক মতে কনফুসীয়বাদ একটি বুদ্ধিজীবী চিন্তাধারা, অর্থাৎ 'চিয়া'। তবে কনফুসীয় চিন্তা জু চিয়াও, কুঙ (কনফুসীয় পরিবারের নাম) চিয়াও, লি (কনফুসীয় আনুষ্ঠানিকতা) চিয়াও প্রভৃতি নামেও পরিচিত। অর্থাৎ একে ধর্মীয় পর্যায়েও ফেলা হয়েছে।

কনফুসীয় তত্ত্ব নৈতিক দর্শনের জন্যই বেশি খ্যাত। চীনে কনফুসীয়সের

সময় হল খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৫১—৪৭৯ অব্দের মধ্যে। তাঁর চিন্তাধারা 'এক দর্শনে'র দর্শন হলেও ধর্মীয় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কনফুসীয় তত্ত্বে মরমিয়া ভাবের অভাব থাকলেও তৎপন্থী মেনসিয়াস-এর (Mencius, খ্রীঃ পূঃ ৩৭ —২৮৯ অব্দ)-এর গ্রন্থ মরমিয়া ভাব ভাব ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

কনফুসীয় তত্ত্বের আত্মচর্চার কথা মূলত ব্যক্ত হয়েছে—চুঙ্, ইয়ুঙ্ (Chung-yung) গ্রন্থে। এ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে, কনফুসীয়স স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যথার্থ সংহতি অনুভব করেছিলেন। কনফুসীয়সের নৈতিক দর্শন যথার্থ সত্তার সঙ্গে ঐক্য সাধনে ধর্মীয় চরিত্রই লাভ করেছে।

কনফুসীয়স মানুষে মানুষে নৈতিক সম্পর্ককে একটি দৈবী ভিতের উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন কনফুসীয়স স্বয়ং। তিনি ধর্মপ্রবর্তক অপেক্ষা শিক্ষক হিসেবেই বেশি পরিচিত। মানবতার যথার্থ বোধই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়, একে বলা হয় 'জেন' (Jen)। বৌদ্ধধর্মের করুণা ও খ্রীষ্টধর্মের প্রেমের মতই হল এই 'জেন'। মানুষের কর্তব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল 'জেন'। কনফুসীয় চিন্তা মানুষের নৈতিকতার উপর জোর দিলেও কনফুসীয়স নিজেই বলেছেন যে, স্বর্গ তাঁকে রক্ষা করছেন এবং তাঁকে বাণী দান করছেন। স্বর্গই হল ধর্মের উৎস, সেই ধর্মই রয়েছে আমার মধ্যে।'

ধর্মীয় ভিত্তিকে মানুষের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য কনফুসীয়স ধর্মগুরুর মর্যাদা লাভ করেছেন। মেনসিয়াস একজন মরমিয়া শিক্ষক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন। তিনি এমন এক আন্তর সত্যের কথা বলেছেন যার অর্থ—মানুষের ভেতরে তাঁর চেয়ে বড় এক সত্তা রয়েছে [ভারতীয় বাউলদের 'এই মানুষে আছেরে মন, যারে কয় মানুষ রতন' বা Pascal-এর সেই কথা 'The heart has its reason of which reason knows nothing'-এর মত]। মেনসিয়াস বলেছেন, 'আমার ভিতরই সব রয়েছে' [ভারতীয় তন্ত্রে সেই গানের মতন 'ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলাম্বর'] আমি যখন একান্তভাবে নিজের মধ্যে তাকাই তখন পরম এক আনন্দ অনুভব করি।'

কনফুসীয় তত্ত্বে যে জিনিস ছিল অস্পষ্ট, মেনসিয়াসের বক্তব্যে তাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কনফুসীয়স স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। কিন্তু তৎপন্থী মেনসিয়াস এই দুইকে কেন্দ্র করেই তাঁর তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে স্বর্গীয় সত্তা, বিশ্বজগতের ঐশ্বরিক শক্তি, মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে অবতরণ করেছে। তিনি মনে করেন যে,